Fig. 1

Fig. 2

'স্বধর্মা' ভবনের পাঠকক্ষে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ১৯৪০

পরিমল গোস্বামীর সৌজন্যে

Fig. 3

॥ জীবন-কথা ॥

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

সূচি

Fig. 8

পঁচাত্তর বছর বয়স পেরিয়েছি, পঞ্চাশ বছর আমার ঘর ক'রে গৃহিণী দেহরক্ষা ক'রলেন।* ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শিক্ষাকাল গার্হস্থ্য আর বাণপ্রস্থ পেরিয়ে সন্ন্যাস আশ্রমে পৌছুলুম—ভাবলুম জীবনে উচিত ব্যবস্থা-ই হ'ল—অধ্যাপক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ যে ব'লেছিলেন—The last lap of the journey is best made alone. জীবনের "সু" আর "কু", ভালো আর মন্দ, উপায়ান্তর নেই দেখে নিস্পৃহভাবে দুটোকেই গ্রহণ করবার চেষ্টা করি। তবে ইদানীং একটা কথা মনের মধ্যে অহরহঃ জাগে—জীবনের অন্তরালে কী আছে? কেন জগতে আমার এবং আমার মতন কোটি কোটি মানুষের আগমন হ'ল, হ'চ্ছে, হবে—জীবন তো আমি কাটিয়ে দিলুম প্রায়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য কী? সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কত কিছু দেখে গেলুম, ক'রে গেলুম,—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রশ্ন আসে—"কিন্তু কেন?"—এই প্রশ্নের উত্তর তো এল না।[১]

জ্যোতিষী বন্ধুরা আমার ঠিকুজি দেখ্‌তেন, হাত দেখ্‌তেন। নিজেও একসময়ে আগ্রহ ক'রে দেখাতুম। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো?" উত্তরে বলি, "কতক কতক, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।" জ্যোতিষীরা আমার জীবনের যে ভবিষ্যদ্বাণী মাঝে-মাঝে ক'রেছেন, তার আদ্ধেক মিলেছে আদ্ধেক মেলে নি। যেখানে মিলেছে, সেখানে স্বীকার করি। কেন মিল হয়, তার কারণ জ্যোতিষীরা যা বলেন, তা মেনে নিতে পারি না, সে-সব কারণ পূরাপূরি তাঁদের যুক্তি অনুসারে স্বীকার ক'রতে খট্‌কা লাগে, বাধা আসে—মনে হয়, আরও কিছু ভিত্‌রী রহস্য র'য়ে গেল। তবুও, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কিছুটা মেলে দেখে, আমি ইদানীং অর্থাৎ বছর দশ বারো পূর্ব পর্য্যন্ত দু'চার জন নামী জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি—"দেখুন তো আপনাদের শাস্ত্র কী বলে, আমার ঠিকুজি বা হাত দেখে—একটা শাশ্বত সত্তা,

---

* সুনীতিকুমারের সহধর্মিণী কমলা দেবী দেহরক্ষা করেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর।
—অনিলকুমার কাঞ্জিলাল।

১ শেষে 'টীকা' দ্রষ্টব্য।—অ।

সার সত্য, জীবনের পিছনে যদি কিছু থাকে, সে সম্বন্ধে কোনও অনুভূতি বা উপলব্ধি আমার হবে কি না, আর যদি হয় তো কবে?" তাঁদের মধ্যে দুই একজনের কাছে আংশিক উত্তর পেয়েছি—"৭৫ বছর বয়সের পরে ধীরে ধীরে আপনি এ বিষয়ে এ জীবনের মতন আপনার প্রশ্নের সমাধান পাবেন।"

এখন এই ৮০ বছরের পরে যে সমাধান পেয়েছি, সেটা হ'চ্ছে যে—আমরা কিছুই জানি না, আর গভীরতম অন্তর থেকে এটাও ধ্বনিত হ'চ্ছে, এ জীবনে কিছু জানা যায় না। চিন্তার ধারা এখন কোথায় এসে পৌঁছুল বা পৌঁছুচ্ছে? এই অজ্ঞ বৃদ্ধের জল্পনা-কল্পনার কোনও মূল্য নেই, কিন্তু তবুও প্রশ্নের যে উত্তর পাচ্ছি, অনেক চিন্তা ক'রে জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে, আর কোনও উত্তর না পাওয়ায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'চ্ছে। এই যে বিশ্বপ্রপঞ্চ, যার মধ্যে আমরা র'য়েছি, সেটা কী বিরাট্ কী মহান্, সে বিষয় ভাব্‌তে গেলে মাথা ঘুরে যায়। Billions of light years লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ ধ'রে চ'ল্‌তে পারলেও আমাদের এই Cosmos এই শৃংখলিত বিশ্বের থই পাওয়া যায় না, তার অন্তে পৌঁছুনো যায় না; আমরা সব কিছু ধরি-ধরি ক'রেও যা ধ'রতে ছুঁতে পারছি না। অথচ একটা নিয়ম সেখানে যেন কাজ ক'রে যাচ্ছে—নিয়মের ব্যত্যয় আমাদের চোখে অনেক রকমের আছে তাও বোঝা এখনও সম্ভবপর নয়, সেই একটা নিয়ম মান্‌তে হয়; কিন্তু নিয়মের নিয়ামক সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি তো হ'চ্ছে না সে উপলব্ধি তাঁদের হ'য়েছে ব'লে যাঁরা মনে করেন, ঘোষণা করেন, তাঁরা আমাদের নমস্য; তাঁদের কথায় অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের তো কই সে উপলব্ধি বা অনুভূতি হ'ল না যাঁরা সহজ সরল বিশ্বাসের সঙ্গে, নানা রকম পূজো হোম মুদ্রা জপতপের মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়ে, কোনও দেব বা দেবীর সুন্দর মহনীয় কল্পনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি ক'রতে চান, অন্যের সঙ্গে যাঁদের বিরোধ নেই, তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কিছু জানা গেল না বোঝা গেল না আমাদের এই মানুষী বুদ্ধি নিয়ে—যদিও এ বিষয়ে গত তিন চার হাজার বছর ধ'রে মানুষের জান্‌বার চেষ্টার অভাব হয় নি, সে চেষ্টার অন্তও নেই। সুসভ্য হবার পরে যখন থেকেই মানুষের সমাজের জ্ঞানী গুণী বৃদ্ধেরা এ বিষয়ে চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন, তখন থেকে আমরা পাচ্ছি প্রাচীন ভাবুক দার্শনিক সত্যসন্ধানী ঋষিদের—যাঁদের বিচার আর উপলব্ধি এখনও এই অজ্ঞাত সত্তার সম্বন্ধে আধুনিক যুগেরও মানুষের মনেও

কাজ ক'রছে—বাবিলনের সুমের জাতির ধর্মগুরু, মিশরের রাজা ও দার্শনিক আখন-আতন, আদি-আর্য্য ঋষি, য়িহুদীদের আদি-পুরুষ মোশেহ্, অত্রি অঙ্গিরা মরীচি কশ্যপ ক্রতু ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য প্রভৃতি বৈদিক আর সত্যকাম উদ্দালক শ্বেতকেতু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি উপনিষদের ঋষি, য়িহুদী পরমেশ্বর যাহ্‌বেহ্-ভক্ত 'ভাববাদী' বা তত্ত্বজ্ঞ য়িহোশূআ বা ইসায়া, ইরানের ঋষি জরথুশ্‌ত্র, চীনের ঋষি লাউ-ৎসে, ভারতের বুদ্ধ আর মহাবীর, প্রাচীন গ্রীসের সোক্রাতেস, প্লাতোন্, ও অন্য দার্শনিকগণ, যীশু খ্রীস্ট—এঁরা সকলে দু হাজার বছর ধ'রে উপদেশ দিয়ে, নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, যেন চিরকালের তরে, সভ্য মানুষের মনের কাঠামো গ'ড়ে গিয়েছেন। এঁদের পরে সম্পূর্ণ রূপে নোতুন কথা আর কেউ বলেন নি—যাঁরা এঁদের পরে এসেছেন তাঁরা এঁদের কথাই নানা ভাবে নোতুন ঢঙে কতকগুলি বিষয়ের উপরে জোর দিয়ে বল্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। বেশির ভাগ সাধারণ মানুষে এতেই খুশি—এতেই তৃপ্ত।

কিন্তু এখনও এমন মানুষও প্রচুর দেখা যাচ্ছে, পুরাতন ঋষি-বাক্যে, শাস্ত্র-বাক্যে যাঁদের মন আর ভরছে না। সংশয় সন্দেহ আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আলোক পাতের সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তাশীল মানুষকে বিচলিত ক'রছে। নোতুন-নোতুন খট্‌কা দেখা দিচ্ছে।

পিছনের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথায় একটু স্মৃতি-চারণ করা যায়। জন্মগত অধিকারের দাবিতে, ধর্ম-বিষয়ে ভুঁই-ফোঁড় হ'য়ে, নিজেকে আর নিজের ধর্মগোষ্ঠীর সমাজের প্রচারক বা গুরুদের সব-জান্‌তা ঠাউরে, একটু আত্মপ্রসাদ, কোথাও বা একটা জাতিধর্মগত অহংকার নিয়ে, ধর্ম ঈশ্বর মানব-জীবনে জীবনোত্তর অস্তিত্ব প্রভৃতি ধ'রে পাকা-পোক্ত একটা বিশ্বাস আঁকড়ে থাকৃতে পারলেই যেন সকলে সুখী। পাঁচ রকম অস্বস্তিকর ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার একটা আরাম এতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ জগতের সমস্ত কিছুর মতো স্থিতিশীল নয়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তার দেহের মধ্যে যেমন মনের মধ্যেও তেমনি ক্রমাগত পরিবর্তন হ'চ্ছে। নিজেকে যে জানতে চায় সে এই দৈহিক আর মানসিক পরিবর্তন বিচার ক'রে দেখে, এতে আত্ম-সমীক্ষার একটা আনন্দ পায়। বিশেষ ক'রে মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে। আবার এই আনন্দের মধ্যে একটু ভাবনায় বা সন্দেহেও প'ড়ে যায়। সেই

চিন্তা, ভাবনা বা সন্দেহকে—সুবিচারের দৃষ্টিতে দেখে, ইংরিজিতে divine discontent-ও বলা হ'য়েছে—এক "দিব্য সংশয়-বোধ"। আমার নিজেকে দেখে ধারণা দাঁড়িয়েছে, আমরা কেউ-ই অজ্ঞাত জগৎ সম্বন্ধে, বাল্যে শিক্ষা বা অনুকরণে প্রাপ্ত প্রচলিত বোধ বিচার বা বিশ্বাস নিয়ে চিরকাল থিতু হ'য়ে ব'সে নেই, ব'সে থাকতে পারি না। absolute, unchangeable, irrevocable Truth, Dogma, Doctrine, বা "ঈশ্বরের বাণী", "অপৌরুষেয়" বেদবাক্য বা চরম উপদেশ ব'লে একটা কিছু ধ'রে থাকলে, ধর্ম বিষয়ে "ভদ্রলোকের এক কথা" এই ব'লে ব'সে থাকলে, শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তির অপব্যবহার করাই হয়। পা না ফেল্‌লে চলা হয় না, ধাপ বা সিঁড়ি বেয়ে না উঠ্‌লে উঁচুতে ওঠা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মতন তত্ত্ববিদ্ ঋষি, বিশ্বনিহিত রভসানন্দের অদ্বিতীয় অধিকারী মনীষী নিজ সুদীর্ঘ জীবনে সারসত্য সম্বন্ধে এক মত হ'তে মতান্তরে পৌঁছেছিলেন ; একই সময়ে হয়তো পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই এমন একাধিক বোধ বা বিচারও তাঁর ছিল, কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—তাঁর লেখার মধ্যে, কৈশোরে যখন উপনয়ন-কালে তাঁর সাবিত্রীদীক্ষা উপনিষদের বাতাবরণের মধ্যে হ'ল, তখন থেকে 'সোনার তরী', 'জীবন-দেবতা', 'গীতাঞ্জলি', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর মতবাদের মধ্য দিয়ে, সর্বশেষে তিরোধানের সাতদিন মাত্র পূর্বে তাঁর জীবনের যে শেষ কবিতাটি তিনি রচনা ক'রে মুখে ব'লে যান সেই চরম অভিজ্ঞতার প্রকাশ "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনাজালে,/ হে ছলনাময়ী" কবিতাটি পয্যন্ত, কত বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আর অনুভূতি দেখা দিয়েছে! আমার কাছে এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম, চরম ব'লতেও পারি। তাঁর শেষ কথা যেন এই—সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে যে অজ্ঞাত রহস্য নিহিত, সেই রহস্য, অজ্ঞাত ব্যাপার সম্বন্ধে কেবল যেন আমাদের ছলনাই ক'রছে—নানা প্রকারের ধর্ম-বিশ্বাস অন্ধ-বিশ্বাসের ফাঁদ পাতা র'য়েছে সরল মানুষকে যেন ভোলাবার জন্যই—কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব সেখানেই যেখানে সে এই-সব ধর্ম আর অন্ধ-বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে—নিজের সহজ আন্তর জ্যোতিতে যার চিন্তা-বিচার উদ্ভাসিত—"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/ সে পায় তোমার হাতে/ শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

শিশুকালে, ৭।৮ বছর বয়সের কথা যা মনে আছে, আবৃছা-আবছাভাবে

অথবা স্পষ্টভাবে, তা থেকে ব'লতে পারি যে তখন সাধারণ হিন্দু ঘরের ছেলের মতন ব্রহ্মা বিষ্ণু লক্ষ্মী শিব দুর্গা কালী প্রভৃতি দেব-কল্পনায় বিশ্বাস ক'রতুম, তাঁরা সকলেই আমাদের কল্পিত শাস্ত্রে বর্ণিত স্বশরীরে বিদ্যমান র'য়েছেন, আমাদের ভালোমন্দ সব কিছু তাঁরা দেখছেন, সব ব্যাপারেই তাঁদের সক্রিয় হাত আছে।—কোনও বিপদে আপদে প'ড়লে সহজেই মনে মুখে যে বিপদ্-বারণের জন্য প্রার্থনা আসত, তা ছিল এই ধরনের—"ঠাকুর রক্ষা করো; হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে নারায়ণ, রক্ষা করো, দয়া করো।" ছেলেবেলার মতো শরীরী দেবতার আস্থা এখন আর নেই, কিন্তু এখনও, মানুষী চিন্তার অতীত নই ব'লে, ছেলেবেলাকার সেই পুরোনো প্রার্থনাই মনের ভিতর থেকে বা'র হয়—কার কাছে যায় সে প্রার্থনা তা জানি না। কিন্তু এই মানবিক দৌর্বল্যের জন্য লজ্জার কিছু দেখি না। তখন মনে হ'ত, পূজোর সময়ে ভারতের উত্তরে হিমালয়ের কৈলাস পর্বতে তাঁর গৃহ ছেড়ে, মা দুর্গা তাঁর দুই পুত্র কার্ত্তিক গণেশ দুই কন্যা লক্ষ্মী সরস্বতী আর দুই সখী জয়া বিজয়া এদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দৈবী শক্তিতে হাজার হাজার গৃহস্থের বাড়িতে, শ্বশুরবাড়ি থেকে আদরের মেয়ে যেমন বাপের বাড়িতে আসে, তেমনি পূজোর তিন দিনের জন্য আসেন। আর বিজয়া দশমীর দিন যখন মা দুর্গার বিসর্জনে যাবার সময়ে বাড়ির মেয়েরা আর বাড়ির গিন্নি ঠাকুরকে বরণ ক'রে বিদায় দিতেন, তখন যেন সত্যি সত্যিই মা দুর্গা বাপের বাড়ি ছেড়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বছরকার জন্য শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাচ্ছেন পূজোবাড়ি আঁধার ক'রে, এই ভেবে বাড়ির গিন্নি থেকে মেয়েরা সকলেই, আর আমরা ছেলেরাও মনে ক'রতুম, মা বুঝি সত্যিই চ'লে যাচ্ছেন—সকলেরই চোখে জল দেখা দিত, আমরাও কেউ কেউ হাপুস-নয়নে কাঁদতুম, বয়স্ক কর্তাব্যক্তিদেরও চোখ ভিজে উঠ্‌ত। এই সরল বিশ্বাস জীবনে একটা অনির্বচনীয়তার আনন্দ এনে দিত।

পরে যখন ধীরে ধীরে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে প'ড়লুম, তখন এই শরীরী দেবতার কল্পনা যে নিতান্ত ছেলেমানুষি ব্যাপার, এরকম কল্পনা প্রাচীন আধুনিক একেশ্বরবাদী বহুদেববাদী সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ছিল, আছে আর থাকবেও, এই রকম একটা বোধ এসে গেল। আমাদের বিষ্ণু শ্রী শিব উমা দুর্গা কালী ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে নিছক কল্পনা, এর পিছনে কোনও বাস্তবতা নেই,—কিন্তু কল্পনা হ'লেও বড়ো সুন্দর বড়ো মধুর ছিল, এই

ায়ণা এসে গেল। তেমনি প্রাচীন গ্রীকদের দেবকল্পনা—জেউস্, হেরা, দেমেতের্, আপল্লোন্, আর্তেমিস্, আরেস্, আফ্রোদিতে, আথেনা প্রভৃতির ল্পনাও মনকে অভিভূত ক'রত, কল্পনা হ'লেও তা ছিল অদ্ভুতভাবে সুন্দর, চিত্তকে মথিত ক'রে দিত। অন্যান্য প্রাচীন আর অর্বাচীন জাতির দেবকল্পনা নিয়েও তেমনি মনের মধ্যে ভাববিলাস চ'লত। এই-সব দেবদেবীর কল্পনা, তাদের পুরাণ-কাহিনীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বা ভীষণতা, ভাবপ্রবণ মানবমনের উপরে এ-সবের প্রভাব আলোচনা ক'রে অদ্ভুত আনন্দ পেতুম। এ যেন বিশ্বমানবের চিত্ত-সাগর মন্থন ক'রে এক শাশ্বত দেবজগতের উদ্ভব।—কোনও জাত বাদ প'ড়ত না—তা সে গ্রীকদের মতো আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা যেমন কেল্ট্, ইটালিক, জর্মানিক, বাল্তিক, স্লাব, আর্মানী, হিট্টী-ই হোক, চীনা জাপানী ভোট মোঙ্গল বর্মী হোক, স্বদেশের আদিবাসী কোল ভীল কিরাতই হোক, প্রাগ্-আর্য্য দ্রাবিড়-ই হোক, আফ্রিকার নানা আদিম জাতি-ই হোক, আমেরিকার মায়া আস্তেক প্রভৃতি আমেরিন্দিয়ান জাতি-ই হোক। যেমন যেমন কলেজের জীবনে একটু-আধটু পড়াশুনা ক'রতে ক'রতে এদের সম্বন্ধে জ্ঞান আর কৌতূহল বাড়তে লাগল, তেমনি তেমনি এদের ঘনিষ্ঠ ক'রে আপনার ক'রে দেখবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার প্রসারও হ'তে লাগল। কিন্তু এ হ'ল মানব-জীবনের বিচিত্রতার সাধনা আর তার নানা অপরূপ রূপের মধ্যে মশ্‌গুল হ'য়ে থাকা—আধ্যাত্মিক জগৎ, শাশ্বত সত্তার ঝলক মাঝে মাঝে এক-আধবার উঁকি দিয়ে গেলেও, মানুষ আর তার দেবকল্পনার পিছনে যদি কিছু সার সত্য, শাশ্বত সত্তা থাকে, তার জন্য একটা অস্পষ্টভাবে আকুতি মনের মধ্যে এলেও, তার স্পষ্ট অনুভূতি তো এখনও—প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত এল না।

কিন্তু এর আগেই দুজন বিরাট্ মহাপুরুষের রচনাসম্ভারের সামনে এসে প'ড়লুম। সে দুজনের লেখার সঙ্গে সংস্পর্শ উত্তরকালে আমার আভ্যন্তর জীবন, চিন্তা, রভসানন্দ প্রভৃতির বিকাশে স্পর্শমণির কাজ ক'রেছে—সেই দুজন হ'চ্ছেন বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ।[২] এঁদের কাছ থেকে আমার এই সুদীর্ঘ হ'লেও নগণ্য জীবনে কী পেয়েছি তা ব'লতে গেলে এক মহাভারত লিখতে হয়। তবে এক কথায়, জীবনে শ্রেয় আর প্রেয় যা কিছু লাভ ক'রেছি, সবই এঁদের কাছ থেকে। আমার আর আমার মতন হাজার হাজার অন্ধের চোখ এঁরাই ফুটিয়ে

দিয়েছেন। এ তাঁদের অযাচিত দান। জীবনের সারবস্তুর সম্বন্ধে আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা এঁদের দয়াতেই পেয়েছি, আর এটা না পেলে বাঁচ্‌বার কোনও অর্থই থাকৃত না।

(10. 1. 76 *sine linea*).*

১১।১।৭৬

যে সময়ে মূত, সাকার দেবদেবীদের সম্বন্ধে শিশুকালের আস্থা বিশ্বাস আনন্দে ঘা লেগেছে, মনে একটু অস্বস্তিও দেখা দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে, তখন আমি ইস্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ঠিক চার বছর আগে, বয়স তখন বারো হবে, স্বামী বিবেকানন্দের বই বক্তৃতা আর লেখার সঙ্গে পরিচয় ঘট্‌ল, মোতী শীলের ইস্কুলেই। (কী ক'রে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হ'লুম, সে কথা পরে বিস্তারিতভাবে লেখবার বাসনা রইল)।[৩] বিবেকানন্দের From Colombo to Almora, তাঁর ইংরিজিতে শিকাগোর বক্তৃতা, তাঁর বাঙলা 'পরিব্রাজক', তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', তাঁর 'বর্তমান ভারত', আর তাঁর অন্য সহজবোধ্য লেখা প'ড়তে লাগ্‌লুম। যেন এক সত্যদ্রষ্টা ঋষির উপদেশ আমার কাছে এসে পৌঁছুল। ধীরে-ধীরে সগুণ আর নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা বিচার মনের মধ্যে স্থান ক'রে নিলে। বেদান্ত অনুসারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা পেয়ে তৃপ্ত হ'লুম, হিন্দুধর্মের 'বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা' এসে মনকে দখল ক'রলে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার কিছু আগেই বোধ হয়, পাঞ্জাব কি গুজরাট থেকে ক'লকাতায় প্রচারার্থ আগত দীর্ঘকায় এক আর্য্য-সমাজী সন্ন্যাসী ক'লকাতার ছাত্রদের অনেকের মনে প্রভাব বিস্তার ক'রলেন। (সেই সময়ে North-West Frontier Province-এর ডেরা গাজী খাঁ কি ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ থেকে টহলরাম গঙ্গারাম নামে এক পাঞ্জাবী হিন্দু রাজ-নীতিক বক্তা আর ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে আর ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে শক্তিশালী প্রচারক ক'লকাতায় এলেন। ইংরিজিতে বক্তৃতা দিয়ে, বাঙালী

* লাতীন ভাষার এই কথা দুটির আক্ষরিক অর্থ without a line, অর্থাৎ তারিখটি মাত্র লেখা ছাড়া, এই দিন একটি লাইনও লেখা হয় নি। বহুদিন এমনই হ'য়েছে। আপিসে এসে ব'লেছেন, 'কলম ধ'রেছি, এক ভদ্রলোক এসে হাজির, একেবারে নাছোড়বান্দা, তিনি যেতে/থাকতেই আর একজন—সকালটা নষ্ট হ'ল।' —অ।

ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ক'রে ঘুরিয়ে বেড়িয়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ক'রে গেলেন—আমরাও দলে ভিড়ে তাঁর পিছনে পিছনে ইংরিজিতে 'জাতীয় সংগীত' God save our Ancient Hind / Ancient Hind once Glorious Hind/From Kashmir to Cape Comorin ইত্যাদি গাইতে গাইতে টহল দিতে লাগ্‌লুম)। শঙ্করানন্দ স্বামী বাঙালী হিন্দু ছেলেদের জন্য উপনিষদের ক্লাস শুরু ক'রে দিলেন—সহজ-বোধ্য ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে তিনি আমাদের ঈশ, কেন, প্রশ্ন আর দু-একটা ছোটো ছোটো উপনিষৎ পড়িয়ে দিলেন—আর উৎসাহ ক'রে ঘরে ব'সেই, স্বামীজীর প্রভাবের ফলে, আমি কঠোপনিষদ্‌ও প'ড়ে ফেল্‌লুম। আর্য্যসমাজী ব্যাখ্যা শুনে মাথায় একগোছা টিকিও রাখ্‌লুম। এইভাবে আমি ১৬।১৭ বছর বয়সেই স্বামী বিবেকানন্দের মতানুযায়ী বেদান্ত-বিশ্বাসী; আর টহলরাম গঙ্গা-রাম আর শঙ্করানন্দ স্বামীর অনুসরণে, ভারতের স্বাধীনতাবাদী হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী (সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নয়—খ্রীষ্টান আর মুসলমান ধর্মে কিছু ভালো জিনিস, যুক্তিসহ বিচারের সন্ধান পাওয়া গেলে সে সম্বন্ধেও আগ্রহী), উপনিষদের শিক্ষার আধারে যার মন গ'ড়ে উঠ্‌ছে এমন বুদ্ধি-বিচার-নিষ্ঠ গায়ত্রী-মন্ত্র-পাঠী কিশোরে বা তরুণে পরিণত হ'লুম (বিশেষ ক'রে পৈতে হ'য়ে যাবার কিছু পর থেকেই—শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সন্ধ্যা-শিক্ষার বই ভালো ক'রে পড়বার পরে)।

১৯০৩ সালে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ঐ বৎসরও আমার সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি বড়ো জিনিসের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে, সেটি হ'চ্ছে, ক'লকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের ছবির গ্যালারিতে। একদিন বিকালে, একসঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের মোগল রাজস্থানী কাংড়ী চিত্র-কলার প্রথম দর্শন, আর অবনীন্দ্রনাথের কয়খানি ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'সিদ্ধ-দ্বন্দ্ব', 'গ্রীষ্ম', 'বসন্ত', 'অভিসারিকা', 'দীরালী',—'জ্যোৎস্নারাতে খোলা ছাতে গানবাজনার জলসা'—আর তা ছাড়া fresco বা ভিত্তিচিত্র 'কচ ও দেবযানী' আর 'রাধাকৃষ্ণ'। এই-সব ছবি চোখের ভিতর দিয়ে আমার আভ্যন্তর শিল্পচেতনাকে, আর সঙ্গে-সঙ্গে আত্ম-

দিদৃক্ষাকে নোতুনভাবে জাগিয়ে তুল্‌লে, আত্মসমীক্ষার পথে যেন অনেকটা এগিয়ে দিলে। বিবেকানন্দের রচনা প'ড়ছি, আর সপ্তাহে একদিন ক'রে সময় ক'রে নিয়ে আর্ট ইস্কুলে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐ কয়খানি ছবি, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তখনকার Halliday Street (এখন নাম হ'য়েছে চিত্তরঞ্জন আভেনিউ, মধ্যে এর নামকরণ হয় Central Avenue)-এ অবস্থিত মোতী শীলের ইস্কুল পালিয়ে বুধবার দিন বিকালে, চৌরঙ্গী রোডে মিউজিয়ামের পাশে আর্ট ইস্কুলে হেঁটে গিয়ে দেখ্‌তে যেতুম। আর্ট ইস্কুলের প্রিন্সিপাল হ্যাভেল সাহেবের সংগৃহীত মধ্যযুগের ভারতকলার ছোটো ছোটো পটগুলিও ছিল অন্যতম আকর্ষণ।*

মনের মধ্যে অবস্থিত অব্যক্ত শিল্প-প্রীতি এই-সবে রূপ পাচ্ছে, এমন সময়ে ১৯০৪ সালে, তখন ইস্কুলের থার্ড ক্লাসে পড়ি, চোদ্দ বৎসর বয়স, তখন মানসিক জীবনের উন্মেষে প্রথম এক নবীন অব্যক্ত অনুভূতি এল, সাহিত্যিক বিচার-বোধকে যেন এই প্রথম জাগিয়ে দিলে, অবচেতনায় নোতুন সাড়া পেলুম—সেটি হ'ল রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শ লাভ।

চোদ্দ বছরের ছেলের মনের মধ্যে যে মানসী দেবী সুপ্ত ছিল, এইবার যেন সোনার কাঠির ছোঁয়াচ পেয়ে তার জাগো-জাগো ভাব এল, পুলক-বিস্ময়-মেশা কৌতূহল যেন তার জগৎ বা বহিঃপ্রকৃতি আর মন বা অন্তঃপ্রকৃতিকে নোতুন রঙে রঙিয়ে দিলে। থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন বয়সে একেবারে শিশু না হ'লেও, ক্লাসের সব ছেলেদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে ছোটো ছিলুম, অন্ততঃ চেহারায় গৌরবর্ণ ফুটফুটে দেখতে ছিলুম—পরীক্ষায় ফল ভালো ক'রতুম ব'লে সব মাষ্টারদের প্রিয়পাত্র ছিলুম—ক্লাসে আমার যেন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, আধিপত্য ছিল। এমন সময়ে ঐ ক্লাসে একটি নোতুন ছেলে এসে ভর্তি হ'ল। তাতে মনে হয়, এইবারে আমার বুঝি প্রতিপত্তির এক অংশীদার এল। সে হ'ল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বা গোরা, বয়সে আমার চেয়ে বোধ হয় এক বছর ছোটো, কিন্তু দেখতে আমার

চেয়ে আরও ছেলেমানুষ বা কমনীয় ছিল, ক'লকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের পুরাতন বংশের ছেলে—'সংবাদ-প্রভাকর'-এর স্থাপয়িতা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের [ভাই রামচন্দ্র গুপ্তের] প্রপৌত্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন তার পিতা। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সুবিধা হবে ব'লে, শান্তিনিকেতনের ইস্কুল ছেড়ে ক'লকাতার মোতী শীলের ইস্কুলে এসে আমাদের সহপাঠী হ'ল। একে দেখে, একটু কৌতূহল হ'ল, প্রচ্ছন্ন আনন্দও হ'ল, আবার ক্লাসে আর ইস্কুলে আমার পসার মাটি ক'রবে আশঙ্কা ক'রে একটু অস্বস্তি আর রাগও হ'ল। তবে আমি যেচে গোরার সঙ্গে ভাব ক'রলুম। ব'নেদী হ'লেও ধনী ঘরের ছেলে নয়। ইস্কুল ভাঙলে পরে বিকালে হ্যালিডে স্ট্রীট থেকে গোরা মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে (গ্রে স্ট্রীটের কাছে) আর আমি সুকিয়াস্ স্ট্রীটে আমাদের বাড়ি ফিরবার সময়ে প্রায় প্রতিদিন একসঙ্গেই ফিরতুম—এইভাবে ক্লাসের ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে আরও বাড়ে। ইস্কুলে প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের আর রাবীন্দ্রিক মানসিক আর সৌজন্যময় আচরণের মর্য্যাদা নিয়ে যখন ক্লাসে আসত, তখন আমাদের মনে একটু অবজ্ঞা-পূর্ণ কৌতূহলের অন্ত ছিল না। গোরার একখানি খাতায় একদিন দেখলুম—রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোটো কবিতা, গোরার নিজের হাতে লেখা—যেমন "পঞ্চনদীর তীরে/বেণী পাকাইয়া শিরে/দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে/জাগিয়া উঠেছে শিখ—/ নির্মম নির্ভীক।" আর 'প্রার্থনাতীত দান'—"পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল/বন্দী শিখের দল—" ইত্যাদি। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা। আমার কাছে একেবারে নূতন বস্তু—আগ্রহের সঙ্গে তখনই প'ড়ে ফেল্‌লুম। বিষয়-বস্তুর রস অনির্বচনীয়, ভাব নোতুন, ভাষার ঝংকার নোতুন। আমি তো নোতুন অপ্রত্যাশিত এক জগতের যেন খবর পেলুম।[৪] এদিকে ক্লাসের প্রায় সকলে, সহপাঠীদের কেউ কেউ আর মাষ্টারদের মধ্যে বিশেষ ক'রে অঙ্কের মাষ্টার (নানা গুণে তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন) সেই গিরিজাবাবু—সবাই জানতে পারলে যে নোতুন ছেলে গোরা রবীন্দ্রের কবিতার খুব চর্চা করে, রবীন্দ্রভক্ত, "রাবীন্দ্রিক"।

১৪।১।৭৬

ছাত্রদের মধ্যে গিরিজাবাবুর নামডাক ছিল। তিনি অঙ্কের মাষ্টার হ'লেও সাহিত্য-চর্চা ক'রতেন, কবিতা রচনাও ক'রতেন। আমাদের মধ্যে যখন কোনও কবিতার দরকার হ'ত—যেমন কোনও মাষ্টারমশাই ইস্কুল থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সভা ক'রে ছাত্রেরা তাঁর নামে শ্রদ্ধা-উপহার দিয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রবে, তখন আমরা গিরিজাবাবুর শরণাপন্ন হ'তুম। তিনি অবলীলাক্রমে আমাদের কবিতা লিখে দিয়ে খুশি ক'রে দিতেন—"ভকতি-কুসুম করিয়া চয়ন গাঁথিয়াছি এই ফুলহার। লহ লহ দেব! লহ গো মোদের শ্রদ্ধার এই উপহার ॥", ইত্যাদি। এখন, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোধ হয় বুঝতেন না, তাঁর ভালো লাগ্‌ত না, তাই তিনি সময় পেলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা ক'রতেন। ক্লাসে সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে আগত রবীন্দ্রভক্ত নোতুন ছাত্রটিকে পেয়ে, তিনি উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্র-রচনার বিদ্রূপ আরম্ভ ক'রলেন—"কি হে, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ মস্ত কবি, না? তিনি কেমন কবিতা লেখেন, জানো?—'আমি আছি ব'সে, তারা প'ড়ল খ'সে!" ব'লে তিনি নিজেই খুব হাসতেন, আমরাও কেন হাসছি ঠিকমতো না বুঝে তাঁর হাসিতে যোগ দিতুম। বেচারি গোরা একটু ভেকা ব'নে যেত। পরে একসঙ্গে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার দীর্ঘ পথে সে ভদ্রভাবে আমার কাছে অনুযোগ ক'রত—"তোমরা তো কেউ আমাদের গুরুদেবের কবিতা পড়ো নি, পড়ো না—তোমাকে ব'লছি প'ড়ে দেখ, নিশ্চয়ই ভালো লাগ্‌বে—একবার প'ড়লে আর ছাড়তে পারবে না।" কবিতা পড়ার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু গোরার কথা মনে হ'ল যেন তার চ্যালেঞ্জ। বললুম, "বেশ, প'ড়বো, তবে তুমি আমায় রবিবাবুর বই দিয়ো, আর ভালো কবিতা বেছে দিয়ো।"

১৬।১।৭৬

ইস্কুলে আলাদা ব'সে যে গোরার তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র-কবিতার চর্চা ক'রবো তার স্থান আর সময় ছিল না। টিফিনের আধঘণ্টা অন্য ছেলেদের সঙ্গে হৈ-হল্লা ক'রেই কাটত—সাহস হ'ত না তাদের বাদ দিয়ে কাব্য-চর্চা ক'রবো, নিরিবিলির ছিল একান্ত অভাব। তাই আমরা ঠিক ক'রলুম, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে, মুখ-হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে দুজনে জমা হবো হেদুয়া পুখুরের

ধারে। তখন তো ক'লকাতা অত ঘিঞ্জি জায়গা ছিল না। মানিকতলা স্ট্রীটের ধারে, সিমলা বাজারের কাছে এই হেদুয়া পুখুর—পরে ইংরিজি নাম হয় 'কর্নওয়ালিস্ স্কোয়ার'। এর পূব দিকে 'জেনেরাল আসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌স্টিট্যুশন'-এর ইস্কুল আর কলেজ, আর কোনও এক বিলিতি খ্রীষ্টান সমিতির প্রতিষ্ঠিত এক মেয়ে-ইস্কুল আর মেয়ে-মিশনারিদের আবাস-গৃহ, আর পশ্চিম দিকে ছিল গভর্নমেণ্টের পরিচালিত মেয়েদের ইস্কুল আর কলেজ 'বেথুন কলেজ', একটি খ্রীষ্টান গির্জা, আর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের একটি হল-ঘর। উত্তর-পশ্চিম কোণে এক ঠিকে-গাড়ির আড্ডা, আর খোলার চালের মাট-কোঠায় মুসলমান বাবুর্চী-খানা। সমগ্র পল্লীর পরিবেশ সেকেলে, কোনও রকম ভীড় বা গোলমাল নেই। ডিমের আকারে হেদুয়া পুখুরের ঘাসে-ভরা গ'ড়েন পাড় চারদিকের পায়ে-চলা রাস্তা থেকে জল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে—সেই গ'ড়েন পাড়ে ঘাসের উপরে ব'সে বা গা এলিয়ে দিয়ে আধ-শোয়া হ'য়ে গ্রীষ্মকালের বিকালে আর সন্ধ্যেয় আড্ডা দেবার অমন জায়গা আজকালকার দিনে দুর্লভ। তখন হেদুয়া পুখুরের ধারে রেলিং ছিল না। মোহিত সেনের সম্পাদিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী নিয়ে গোরা আস্‌তো, আর আমরা তখন হেদুয়ার পাড়ে শুয়ে ব'সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তুম। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—নোতুন স্বর্গলোকের দ্বার যেন আমার কাছে খুলে গেল, বা আধ-খোলা হ'ল। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের কবিতা— 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কথা ও কাহিনী', 'ক্ষণিকা', 'শিশু' প্রভৃতির কবিতা অপূর্ব রসে, চোদ্দ বছরের ছেলে আমি, যার চিত্তের বিকাশ তখনও কিছুই হয় নি, তার মন ভরিয়ে দিলে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'-র কল্পনা, নানা ভাবে 'জীবন-দেবতা' কিরূপে তাঁর হৃদয় মনকে, সুপ্ত জাগ্রত চেতনাকে মথিত ক'রেছিল তার আভাস, এ-সব যেন আমারও আধিমানসিক আর আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যেও এক অব্যক্ত শক্তির সঙ্গে এসে অনুপ্রবেশ ক'রলে। "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা", "নিরুদ্দেশ যাত্রা", "মানসসুন্দরী" (এই কবিতার রস তখন বুঝতে পারি নি, 'জীবন-দেবতা' কী ক'রে শিশুকালের ক্রীড়াসঙ্গিনী থেকে তাঁর যৌবনের প্রেয়সী এবং বিবাহিতা সহধর্মিণীর রূপে ধরা দিয়েও দেখা-সাক্ষাৎ ধরা-ছোঁয়ার জগতের উর্ধ্বে র'য়ে গেলেন, অস্পষ্টভাবে প্রণিধানের চেষ্টা ক'রতুম), 'জীবন-দেবতা' পর্য্যায়ের অন্য কবিতা, 'চিত্রা'র "উর্বশী" আর বিশেষ ক'রে "সিন্ধুপারে" কবিতার রোমান্টিক-মিষ্টিক, এর রমন্ন্যাস-রভসানন্দ

হৃদয়কে মনকে আচ্ছন্ন ক'রলে। পরে এই-সব কবিতার প্রতিধ্বনি, কলেজে উঠে ইংরিজি সাহিত্যে কীটস্ শেলি কোল্‌রিজের রচনায় পেয়ে রসানন্দ আরও বিস্তারিত আরও ঘনীভূত হ'ল।"

আমার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে রবীন্দ্রকাব্যজ্যোতি এসে নোতুন প্রাণ এনে দিলে, তাঁর কল্পিত 'জীবন-দেবতা' এক অপরিসীম মূল্য নিয়ে আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাবে আমার মনের মধ্যকার হিন্দু দেব-কল্পনা, শিব-উমা, বিষ্ণু, শ্রী, দুর্গা, কালী প্রভৃতি, যার উপরে বিবেকানন্দের উপদিষ্ট বেদান্ত-চিন্তা এক ধরনের অতি মহনীয় আলোক পাত ক'রেছিল, সেই সমস্তকে এমন একটা নোতুন রূপ দিলে যা অনির্বচনীয়, যার পূরো বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা আমার অপরিপক্ক কিশোর-মনের পক্ষে অসম্ভব ছিল।—এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে এই অনির্বচনীয়তার গণ্ডী বা জাল কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না। এক ধরনের মানসিক-যুক্তি-নিষ্ঠ, অজ্ঞেয়বাদিতা মনে আসে—কিছুই তো জান্‌তে পারলুম না, তবুও এই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়ের টান একটা অনুভব করি—নিজেকেও জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু নিজের কাছেও উত্তর আসে—"আমি কী জানি? কিছুই তো না।"—তবুও রবীন্দ্রনাথের মতোই, আমি 'কী জানি!'* বলার সঙ্গে-সঙ্গে এক অব্যক্ত ক্রন্দন আসে, সমগ্র অস্তিত্বকে আলো-করা দুরাপনা বায়ুর মতো অজ্ঞেয় উর্বশীর জন্য, মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা আর প্রার্থনা জাগে। এই জীবনে তাকে বুঝি বা না বুঝি, জানি বা না জানি, কেবল অকারণ রসানন্দেও "প্রাণ উঠে যেন পুলকি।"†

বেদের আর উপনিষদের কতকগুলি মহাবাক্য, নিজের আভ্যন্তর জিজ্ঞাসার অস্বস্তি আর সেই অস্বস্তির এক প্রকারের সমাধান, আর তাঁর রচনার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে (এবং কখনও-কখনও পরস্পর-বিরোধী ভাব বা চিন্তা বা অনুভূতি-পরম্পরার মাধ্যমেও) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি আর অনুভূতি, তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধ, "কিন্তু কেন?" এই প্রশ্ন অহরহঃ তাঁর মনকে কাতর করা সত্ত্বেও একটা আশা-মূলক অজ্ঞেয়বাদে বোধ হয় তিনি শেষকালে পৌছান। নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ নানা দেবকল্পনা, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ, অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শাস্ত্র, পাপপুণ্যের

* দ্রষ্টব্য "আমি শুধু বলি, 'কী জানি! কী জানি!'", উৎসর্গ, ৬-সংখ্যক কবিতা, ১ম স্তবক।—অ।

† দ্রষ্টব্য "চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন/পুলকি।", ঐ, শেষ স্তবক।—অ।

বিচার ক'রে শাস্তি বা পুরস্কার নিয়ে ব'সে আছেন এক ঈশ্বর—এসবের ঊর্ধ্বে অবস্থিত "তৎ সৎ"—যার সম্বন্ধে 'সৎ', 'চিৎ' আর 'আনন্দ' ছাড়া আর কিছু আমাদের মানুষী জ্ঞানদৃষ্টিতে বলা যায় না—মনে হয় সেই রকম একটা বোধ বা বিচারই তাঁর শেষ অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবনের শেষ কথাটি, মৃত্যুর সাত দিন আগে যে কবিতাটি তাঁর মুখের বাণী শুনে অনুলিখিত হয়, সেখানেই কি নিহিত আছে? এই সৃষ্টি একটা ছলনা—নানা ধর্মের অনুষ্ঠানের যত মিথ্যা বিশ্বাস জগৎ জুড়ে নানা ফাঁদ পেতে রেখেছে—যার মানসিক মহত্ত্ব অনায়াসে এই-সব ছলনা আর ফাঁদ কাটিয়ে উঠতে পারে—কী ক'রে তা হয় তা কেউ জানে না—শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে তার হাতে "শান্তির অক্ষয় অধিকার" সে-ই পায়। এইরূপ বিচারে অন্ততঃ আমি এখন এসে পৌঁছেছি—যুক্তি-তর্ক দিয়ে একে খাড়া ক'রতে পারবো না, কিন্তু এইটিই আমার শেষ অনুভূতি। অন্যত্র যে কথা একবার ব'লেছিলুম, তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে এই সুদীর্ঘ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আপাততঃ এখানেই শেষ করি—"যাহা হইবার তাহা হইবেই। মানুষ তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা নহে। আমরা কিছুই জানি না; মনে হয়, এ জীবনে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই বিশ্বাস এখন মনে একটা অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত শান্তি আনিয়া দিতেছে। যাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা সব-কিছু জানিয়াছেন, সত্য বস্তু পাইয়াছেন, তাঁহাদের অবিশ্বাস করি না, তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। কিন্তু আমি জানি নাই। আমার কাছে শাশ্বত সত্তা আবিষ্কৃত হন নাই। সকলেরই এক গতি, তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি নাস্তিক নই। এক মাত্র সত্তা—'তৎ সৎ', যাহা আছে—তাহাই সকল অস্তিত্বকে ধরিয়া আছে, তাহার মধ্যে আমিও আছি। 'তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ—একত্বম্ অনুপশ্যতঃ।' সেই বিরাট্ শান্তি সমক্ষে থাকিলেও, আমি মানুষ, মানুষের অজানা ভবিষ্যৎ কী, এ বিষয়ে চিন্তা আমাকেও পীড়া দেয়। কিন্তু অন্য গতি নাই!" *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮০-তম বর্ষগ্রন্থি উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা-দিবসে (৮ শ্রাবণ, ১৩৮২। ২৫ জুলাই, ১৯৭৫) সভাপতি সুনীতিকুমার যে-ভাষণ দেন, তা থেকে এই কথাগুলি তুলেছেন। কিন্তু 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র ১৩৮২ সালের প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত ভাষণটিতে "সকলেরই এক গতি" স্থলে আছে "সকলেরই এই গতি", আর "অজানা ভবিষ্যৎ কী, এ বিষয়ে চিন্তা" স্থলে আছে কেবল "অজানা ভবিষ্যৎ"; তা ছাড়া, "আমাকেও পীড়া দেয়।". এর পরে "কিন্তু অন্য গতি নাই!", এই বাক্যটি নেই।—অ।

১৭।১।৭৬

তবে একটা কথা। কী, কেন, কে—এ-সবের সমাধান হ'ল না। তবু এই বুড়ো বয়সে, জীবনের শেষ অবস্থায়, ভোর রাত্রে যখন আর ঘুম হয় না—এটা বুড়ো বয়সের ধর্ম—একটা কথা আছে—"পহিল পহর সব কোঈ জাগৈ। দূজ পহর জাগৈ ভোগী। তীজ পহর রোগী জাগৈ। চউথ পহর জাগৈ যোগী॥"—সত্যিই বুড়ো বয়সে আর কিছু না হোক, মানুষকে যোগী বা ভাবনা-চিন্তা-যুক্ত ক'রে দেয়—সেই অতি ভোরে জেগে উঠে, ব'সে ব'সে এই জীবনের সমীক্ষা না ক'রে সিংহাবলোকন না ক'রে পারি না। তখন তো পূর্বাপর অনুধ্যান ক'রে মনে হয়, জীবনে তো সু আর কু, অর্থাৎ ভালো আর মন্দ, Good and Evil, হিন্দীতে যাকে বলে 'ভলা-বুরা', তমিলে 'নলম্ তীবুম্', সুখ আর দুঃখ, দুই-ই র'য়েছে। —কিন্তু আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি কেন এত বেশি ক'রে সু বা যা ভালো, যা কাম্য, যাকে সকলেই প্রার্থনীয় ব'লবে, তাই পেয়ে গেলুম—সু বা ভালোর তুলনায় কু বা মন্দ যা মানুষে চায় না তার ভাগ জীবনে এত কম কেন এল, এর কারণ কী? সকলের কাছ থেকে তো আমি ভালোই পেয়ে গেলুম, মন্দ তো কারো কাছ থেকে মনে রাখ্‌বার মতন তেমন কিছু পাই নি। জীবন পরম আরামে আনন্দে, কৃতকারিতার সঙ্গে, মোটের উপর প্রচুর সুনামের সঙ্গে [কাটিয়ে দিলুম], সকলের কাছ থেকে স্নেহ ভালোবাসা ভক্তি যা কিছু মানুষের কাম্য সবই তো পেলুম। 'অজ্ঞানং পাতকং মহৎ'—যারা অন্যায় ক'রেছে, নাবুঝে হ'য়েই ক'রেছে—তারা যখন বুঝ্‌তে পেরেছে, তখন সব ভালোভাবেই মিটে গিয়েছে। কিন্তু আমি এই এত ভালো পেয়ে গেলুম কেন? জীবনে তো এমন কিছু করি নি যার জন্য এই ভালো পেয়েছি। পুনর্জন্ম কর্মফল প্রভৃতির ব্যাখ্যায় মন তো ভরে না। কিন্তু যখন দেখি যে নানা সদ্‌গুণে, সৎ জীবন যাপনে, লোকের হিতৈষণায় যারা আমার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, সেই রকম কত মানুষ কত দুঃখে কষ্টে ব্যর্থতার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে—যেমন আঁস্তাকুড় খুঁটে খাচ্ছে, যেখানে আমি আরামে আছি, জীবনের বেশির ভাগ সময় তো ভাতের উপরে খালিএকটু নুন নয়, পঞ্চ ব্যঞ্জনও তো জুটেছে—কেন আমার এই সুখ, এই আনন্দ? How did I deserve it? কে আছে যার বিধানে এটা হ'ল? God—a popular premise—বুঝতে তো পারলুম না কার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো, যদিও সে কৃতজ্ঞতার কোনও

মূল্য নেই ?—এখানেই একটা অব্যক্ত আকুতি আসে—"আবিঃ আবীর্ম এধি।" তখন অজ্ঞাতের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা মনকে ভ'রে দেয়, নিজেকে সামলাতে পারি না—বাধা না মেনে রুদ্ধ চোখের জল নেমে আসে। এ রকম অজ্ঞাত অব্যক্তের উদ্দেশে এই অন্ধভাবে হাত্‌ড়ানো, নিরুপায় ক্রন্দন—এতেই সন্তুষ্ট থাকৃতে হয়—এ রকম অবস্থা তো আরও অনেকের, যাদের দৃঢ় আস্থা আর বিশ্বাস নেই তাদেরও তো আছে। কান্না আসে, অনুযোগ আসে আর এক ধরনের শান্তিও আসে—এই নিয়েই, আর দেহ-রক্ষার পরে যা ভবিতব্য তাই আমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে এই বিচার নিয়েই, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব'লে একটা আব্‌ছা-আব্‌ছা কৌতূহল-মিশ্র আশা নিয়েই বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিচ্ছি—এই অবস্থার জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ বা অনপনেয় অস্বস্তি আর এখন নেই। "তৎ সৎ"—যা আছে, তারই জয়! "কো অদ্ধা বেদ ?"—কে-ই বা নিশ্চিতভাবে এই অজ্ঞাতকে জানে ? *

---

* পাণ্ডুলিপির এখানটাতে এসে থেমেছি, সুনীতিকুমার আমাকে ব'ললেন, "রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক' প'ড়েছেন তো—'যারা ব'ললে "জানি", তারা জানল না।' " ('শেষ সপ্তক'-এর নয়-সংখ্যক কবিতার শেষ পংক্তি)।—অ।

(২)

"সু" আর "কু", "ভালো, মন্দ" নিয়ে আমার এই জীবন-কথা কিভাবে প্রকাশ ক'রবো সে বিষয়ে কোনও স্থির সংকল্প নিয়ে লেখা আরম্ভ করি নি। এখন উপস্থিত কালে যে কথাটা বারবার মনে হয়, সব কিছু ছাপিয়ে সেই কথাই যেন আমায় বিব্রত ক'রে তুলেছে—তাকে কেন জানি না ঠেকাতে পারলুম না, জীবনে যে সমস্যার সমাধান হ'ল না সেই সম্বন্ধে আবোল-তাবোল লিখে মনকে একটু হাল্‌কা করবার চেষ্টা ক'রলুম—ভেবে-চিন্তে গুছিয়ে লেখা হ'য়ে উঠল না। এইবার জীবনে যা দেখেছি, যা শুনেছি, মানুষের বুদ্ধিতে যা ধরা যায়, যা মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে আসে, তাই ধরি।

আমার জন্ম হয় বাঙলা ১২৯৭ সালে ১১ই অগ্রহায়ণ, ইংরিজি ১৮৯০ সালে ২৬শে নভেম্বর। ভাগীরথী বা গঙ্গার পশ্চিম তীরে ক'লকাতার উপনগর হাওড়ার অধীনস্থ শিবপুর পল্লীতে মামার বাড়িতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। শিবপুর এখন আমার এই ছিয়াশি বছর বয়সে সর্বগ্রাসী ক্রমবর্ধমান এখনকার কালে অতি নোংরা হাওড়া শহরের কবলে প'ড়েছে, কিন্তু আমার জন্মের সময়ে আর ছেলেবেলায় বহু বৎসর ধ'রে, যৌবনকাল পর্য্যন্ত শিবপুর ছিল ক'লকাতার পাশে অবস্থিত চমৎকার একটি পল্লী-অঞ্চল। গঙ্গার ধারে বড়ো বড়ো চট-কল ময়দার কল দু-একটা খাড়া হ'য়ে গেলেও আর গঙ্গার ধারে মাল-বহা রেলের গাড়ির লাইন থাকলেও, নদীর ধারটুকু তখন নষ্ট হয় নি—স্নানের ঘাটে, নদীর ধারে নৌকো আর পানসির ঘটায়, বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি দুই একটা কাঠের গুদামে বর্মা থেকে জাহাজে ক'রে এনে জমা করায় আর গোরুর গাড়ি ক'রে সেই-সব কাঠ বাইরে চালান দেওয়ার জন্য একটু জমজমাট ছিল। গঙ্গার ধারে শিবপুরের শ্মশানঘাটও ছিল, ঘাট ব'লতে কিছুই নয়, এমনি দু চার ঘর মুরদা-ফরাস, আর দু' পাঁচজন বাঙালী তান্ত্রিক সাধু, একটা গোলপাতার ঘরে এক শিবলিঙ্গ, ঘাটের ধারে রঙ-চটা দু চারটে বৃষ-কাঠ খাড়া ক'রে পোতা—ব্যস্। চটকলের গঙ্গার ধারের সড়কে চটকল আর ময়দার কলের বাড়ি আর রেলের লাইন যেন শিবপুর গ্রামের সঙ্গে খাপ খায় না, এমন বেঢপ সীমারেখা ছিল,

পাশেই গঙ্গা থাকাতেই যেন আধুনিক 'সভ্যতা' আর 'প্রগতি'র এই আক্রমণ সইতে পারা যেত। কিন্তু গ্রামের একটু ভিতরে গেলে, সেই প্রাচীন বাঙালী ভদ্রপল্লীর রূপটি আমার ছেলেবেলায় কৈশোর পর্য্যন্ত নষ্ট হ'তে পারে নি। আর তারই মধ্যে আমার বাল্যজীবনের আনন্দময় স্মৃতি অনেকটা জড়িয়ে আছে।

মামার বাড়ি শিবপুর গ্রাম হ'লেও, আমাদের বাড়ি হ'চ্ছে ক'লকাতায়। ক'লকাতা তখনও মোটের উপরে একটি খাঁটি বাঙালী শহরই ছিল। এখনকার মতো বহিরাগত ভারতীয় নানা জাতির মানুষের ভীড়ে আর তাদের চাপে ক'লকাতা (অন্য সব পুরানো শহরের মতো) তার সরল শান্তিময় স্বস্তিকর পরিবেশ হারায় নি। মাঝে ক'লকাতার লোকসংখ্যায় শতকরা প্রায় ষাট হ'য়ে গিয়েছিল অবাঙালী—বিহারী হিন্দুস্থানী উড়িয়া রাজস্থানী পাঞ্জাবী গুজরাটী। ভারত-বিভাগের পরে পূর্ব-বাঙলা থেকে বিতাড়িত বাঙালী হিন্দুর দল সর্বস্বান্ত হ'য়ে পশ্চিম-বাঙলায় বিশেষ ক'রে ক'লকাতা অঞ্চলে শরণার্থী হ'য়ে আশ্রয় ক'রে নেয়, তাইতেই এই অস্বাভাবিক ভাবে বাঙালীর বাস একটু বেড়ে গিয়েছে, বিগত ২৫ বছরের মধ্যে।

আমার ঠাকুরদাদা (পিতামহ) ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের নিবাসের পত্তন করেন ক'লকাতায়।

বাঙালী রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক (দাক্ষিণাত্য আর পাশ্চাত্য) প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আর কায়স্থ আর অন্যান্য মাননীয় বা পদস্থ বর্ণের মধ্যে কুলজী অর্থাৎ 'কুল-পঞ্জী' বা বংশের ইতিহাস রাখাটাই বাঙালীর সংস্কৃতির একটা অঙ্গ ছিল, সে হিসাবে আমাদের বংশেরও কুলজী ঠাকুরদা সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন, চাটুজ্যে বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ দক্ষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আমার থেকে আটাশ পুরুষ আগে পর্য্যন্ত পূর্বপুরুষদের নাম সেই কুলজীতে পাওয়া যায়। এই যে বংশপীঠিকার বা পীড়ির সব নাম আর ক্রম পাওয়া যায়, তা কতটা সত্য বা নির্ভুল, তা জানবার উপায় নেই। তবে আমাদের বংশের বিভিন্ন ঘরের সব তালিকা মিলিয়ে একটা কিছু কাজ-চালানো, মোটামুটিভাবে মেনে নেবার মতো পীঠিকা বা পীড়ি তৈরি হ'য়েছে। কতকগুলি বহুপ্রচলিত আর যার সম্বন্ধে সত্য ব'লে সকলের বিশ্বাস আছে এমন নাম আর উপাখ্যান

আমরা পাই। এ-সবের আকর বা মূল বই হ'চ্ছে সংস্কৃতে আর বাঙলায় লেখা প্রাচীন বাঙালীর কুলশাস্ত্র; আর আমাদের ঘরে রাখা কুলজী। এই-সব উপাদান নিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কয়েক খণ্ডে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নাম দিয়ে বিরাট এক বই প্রকাশ ক'রেছেন—তার 'ব্রাহ্মণ খণ্ড', 'কায়স্থ খণ্ড' প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ আছে। তাঁর বহু পূর্বে লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' ব'লে তাঁর মূল্যবান্ গ্রন্থে বাঙালী ব্রাহ্মণের কুলের কথা, বিভিন্ন গোত্রের আর তার শাখার ইতিহাস প্রভৃতির প্রথম আলোচনা করেন। এই রকম কুলপঞ্জী বাঙলার বাইরেও অন্যত্র পাওয়া যায়—যেমন আসামে, উড়িষ্যায়, মিথিলায়, উত্তর-ভারতে কনৌজিয়া, গৌড়, সারস্বত, মালবীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে, আর গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কোঙ্কণে, আর তা ছাড়া দ্রাবিড়-ভারতে অন্ধ্রদেশ কর্ণাটক তমিলনাডু কেরলে, তুলুব্‌নাডু কোডগুনাডুতে এই রকম কুল-পঞ্জী পাওয়া যায়। সারা ভারতবর্ষে এখন মূলতঃ পাঠান বা আফগান, ইরানী, আরব প্রভৃতি বিদেশীই হোক্ বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কায়স্থ বৈদ্য জাঠ কলিতা করণ প্রভৃতি স্বদেশীই হোক, উচ্চ বংশের মুসলমান ঘরেও অনুরূপ 'কুর্‌সীনামা' বা বংশপীঠিকা রক্ষিত থাকে। এই-সব কুলপঞ্জী গ্রন্থের বক্তব্য অন্য ইতিহাসের অভাবে আমরা সাধারণতঃ মেনে নিই। কিন্তু খুব খুঁটিনাটির সঙ্গে যাঁরা ইতিহাস-চর্চা করেন, একেবারে অবিসংবাদিত সত্য ব'লে চুলচেরা পণ্ডিতি বিচারে যা উতরায় নি এমন উপাদানে যাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন, আর পারলে পরে পূরোপুরি 'নস্যাৎ' ক'রে দেন, তাঁরা এই কুলজী মানেন না—কুলগ্রন্থকে হেসে উড়িয়ে দেন। যাক্, সে তর্কে এখন যাবো না। তবে বাঙালীর ঘরের কথায় এর একটা স্থান বা মর্য্যাদা আছে—ভারতের বাইরে অন্য নানা দেশেও যেমন।

এই কুলজী-মতে, বিবাদ-গ্রস্ত ব্যাপার সব ছেড়ে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, গৌড়-বঙ্গের কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেনবংশী রাজা বল্লালসেনের আমলে ('বল্লাল' নামটি মূলে কানাড়ী ভাষার), রাঢ়ী আর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা যাদেরকে নিজেদের আদিপুরুষ ব'লে মনে ক'রে থাকেন, সেই রকম পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উত্তর-ভারত থেকে, সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে, জীবিকার সন্ধানে বাঙলায় এলেন।

২২।১।৭৬

তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ভৃত্য বা অনুচর রূপে পাঁচ জন কায়স্থও আসেন, এইরকম 'ইতিহাস' আছে। এঁদের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় আর বেদগর্ভ। শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভারদ্বাজ, বাৎস্য, সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ এঁরা। রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, ভট্টনারায়ণের বংশের। বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শরৎচন্দ্র—এঁরা কাশ্যপ, দক্ষের বংশের। নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে এই-সব বংশের সম্বন্ধে বহু বই আর বড়ো বড়ো বংশলতিকা ছাপা হ'য়েছে।

ক'লকাতা অঞ্চলে আমাদের এই চাটুজ্যে বংশের অন্যতম আদিপুরুষ ছিলেন ভৈরবচন্দ্র। ইনি ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রাম থেকে, পদ্মানদীর দেশ ছেড়ে, ভাগীরথীতীরে এলেন, কিছুকাল পরে দামোদর পেরিয়েও নিজের স্থান ক'রে নিলেন। তিনি ছিলেন মহাকুলীন, পিতৃপুরুষের পাণ্ডিত্যের জোরে বংশ-মর্য্যাদায় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে। শোনা যায় যে মহারাজা বল্লালসেন (কোনও মতে তাঁর এক পূর্বপুরুষ—মহারাজা আদিশূর) পাণ্ডিত্য আর ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা দেখে কনৌজ থেকে আসা এই পাঁচ ব্রাহ্মণের উত্তর-পুরুষ মাত্র ছাপ্পান্ন জন ব্রাহ্মণকে উচ্চতম মর্য্যাদা 'কৌলিন্য' বা 'কুলীনতা' দান করেন। পশ্চিম বঙ্গে, উত্তর-রাঢ় প্রদেশে, আজকালকার বর্ধমান হুগলী হাওড়া জেলায় চব্বিশ পরগনায় এঁদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যেককে এক একটি গ্রাম দেন; যাতে তাঁরা সেই গ্রামের আয় থেকে নিশ্চিন্ত মনে পঠন-পাঠন যজন-যাজন পূজা-হোম প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কাজ ক'রে যেতে পারেন, হিন্দুসমাজে বৈদিক আদর্শ রীতিনীতি ক্রিয়াকর্ম উচ্চ চিন্তা সমস্ত রক্ষা ক'রে যেতে পারেন। এই ৫৬ গ্রামের নাম ধ'রে কুলীন রাঢ়ীদের ৫৬ গাঞি বা গাঁই।

এঁদের মধ্যে, কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ সুলোচন, রাজার দান-করা চাটুতি, বর্ধমান জেলার গ্রাম, থেকে সম্মানিত চাটুতি গাঁইয়ের পদবী পান। 'চাটুতি' বা 'চট্টপুত্রিক' গ্রামের, সংক্ষেপে 'চাটু' গ্রামের* 'জীব বা জীবক, জীয়া,

* 'চাটু' বা 'চট্ট' গ্রামের (দ্রষ্টব্য সুনীতিকুমারের *The Origin and Development of the Bengali Language*, Part I, George Allen & Unwin Ltd., London,

জিয়া' অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তি—আধুনিক হিন্দীতে 'জী, জীউ'—ব'লে বংশ-পদবী 'চাটুর্-জীয়া, চাটুর্জ্যা, চাটুর্জ্যে, চাটুজ্জে' স্থলোচনের উত্তরপুরুষগণ প্রাপ্ত হন। পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের আশপাশে যখন ইংরেজরা বাঙলা দেশের শাসক হ'য়ে বসে, তখন তাদের মুখে এই নামের একটি ইংরিজি রূপ দাঁড়ায়—Chatterjee, Chatterji, Chatterjea, Chatoorjya প্রভৃতি ৮ রকম বিভিন্ন বানানে লেখা হয়। আর ১৭৫০-এর পরে এই নামের এক পণ্ডিতি বা সংস্কৃত রূপও বাঙলা ভাষায় প্রচলিত হয়, 'চট্টোপাধ্যায়'—'জীয়া'র সঙ্গে 'উপাধ্যায়' শব্দের যোগ কল্পনা ক'রে। তদ্রূপ 'মুখটি' বা 'মুখড়া' গ্রাম থেকে 'মুখুর্জ্যা' বা 'মুখুজ্জে', ইংরিজিতে Mookerjee, Mukherji, Mukhurjya প্রভৃতি ১৪ রকমের ইংরিজি বানান, হালের সংস্কৃত রূপ 'মুখোপাধ্যায়'। 'বন্দ্রপুরী' গ্রাম থেকে ভাষায় 'বণ্ডউরী, বাঁড়ুরি, বাঁড়রি' গাঁই, বাঙলায় 'বাঁড়ুর্জীয়া, বাঁড়ুজ্জে', ইংরিজিতে Banarji, Banerjie, Bannerjee ইত্যাদি ৮ রকমের বানান; আর শাণ্ডিল্য গোত্রের 'বাঁড়ুরি গাঁই'-র ব্রাহ্মণদের নিবাস আর একটি গ্রাম 'বন্দি-ঘাটী' থেকে অথবা গ্রামের মূল নাম 'বন্দ্রপুরী' থেকে 'বন্দ' শব্দ নিয়ে, আধুনিক সংস্কৃত রূপ হ'ল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। তেমনি 'গঙ্গাকুলিক' থেকে 'গাঙ্গোলি, গাঙ্গুলি', সংস্কৃতীকরণ 'গঙ্গোপাধ্যায়'। ঢাকা জেলার প্রাচীন গ্রাম 'বাঘিয়া'—ক'লকাতার উচ্চারণে 'বেঘে'—কুলীন গাঙ্গুলী বংশের একটি নামী কেন্দ্র ছিল।

মধ্য যুগের বাঙলা দেশে, সংস্কৃত-আধারিত উচ্চ শিক্ষার একমাত্র অধিকারী ব'লে, রাজার আশ্রয়ে থেকে কিছু ভূসম্পত্তি থাকায় মোটের উপরে স্বচ্ছল অবস্থার উচ্চ শ্রেণীর রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতই নবসৃষ্ট বঙ্গভাষী জনসমূহের মধ্যে বুদ্ধিতে বিদ্যায় জ্ঞানে চিন্তাশক্তিতে বিচারে পরিচালনায় বরাবরই, এখনও পর্য্যন্ত, নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন। ভারতীয় হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তার অধিকারী এক দিকে এঁরা যেমন ছিলেন, তেমনি অন্য দিকে যে সমাজকে তাঁরা পরিচালনা ক'রতেন সেই সমাজে যত কিছু প্রাচীন আর নবীন অবগুণ ছিল,—নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, চিন্তাশক্তি বা কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, সৎসাহস ও বীরত্বের অভাব, নির্বোধ নিষ্ঠুরতা—এ সমস্তই নানাভাবে তাঁদের মধ্যে মানসিক জড়তা ও পঙ্গুতাও এনে দিয়েছিল। কুশাগ্রবুদ্ধি, বরেণ্য ধীশক্তির পাশাপাশি এই সমস্ত অবগুণও ছিল, আর এই-সব

অবগুণই যেন হিন্দুর অন্যান্য সমাজ বা শ্রেণীর মতো ব্রাহ্মণ সমাজকেও আবিষ্ট ক'রেছিল। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে এক নির্বোধ দুরপনেয় কলঙ্ক ছিল কৌলীন্য প্রথা আর তার আনুষঙ্গিক বহুবিবাহ।

কৌলীন্য প্রথার বর্ণনা দিতে ব'সবো না। সমাজের অতীত যুগের এক নির্বুদ্ধিতা ও লজ্জার কথা, ৪।৫।৬ পুরুষ আগে এই কৌলীন্যের মূঢ়তা ব্রাহ্মণ সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল। এক সময়ে, এখন থেকে প্রায় ৫০০।৬০০ বছর পূর্বে, কৌলীন্যের সামাজিক মর্য্যাদার আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই যুগের ব্রাহ্মণ সমাজের সংরক্ষণের জন্য 'মেল-বন্ধন' প্রভৃতি কতকগুলি বিধানের আবশ্যকতা ছিল। পরে সেগুলি নিরর্থক হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে সুখের বিষয়, কৌলীন্যের আর কৌলীন্যের সঙ্গে-সঙ্গে বহুবিবাহের বর্বরতা বেশি দিন ধ'রে সমাজের হানি ক'রতে পারে নি। পূর্বপুরুষের পাণ্ডিত্য আর অন্যবিধ মর্য্যাদার দরুন তাঁদের প্রাপ্ত কৌলীন্যের সুযোগ নিয়ে, লোকের অন্ধ শ্রদ্ধার অযোগ্য পাত্র হ'য়ে, কুলীন ঘরের ব্রাহ্মণেরা, অকুলীন এবং সেইজন্য সামাজিক সম্মানে নিম্ন অন্য ব্রাহ্মণদের চোখে সর্বোচ্চ ব'লে গণ্য হ'তেন, অকুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীন পাত্রে কন্যা দান ক'রে নিজেদের ধন্য ব'লে মনে ক'রতেন। সেইজন্য, যথাসাধ্য অর্থ দান ক'রে, ভূসম্পত্তি দান ক'রে, কুলীন বরে কন্যা দান করার দিকে অকুলীন কন্যার পিতাদের মনে একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখা দিত। ধনী অকুলীন ঘরের মেয়েকে বিবাহ করাটাকে কুলীন ঘরের যুবক ও প্রৌঢ়েরাও যেন অর্থকর একটা ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তার একটা অসুবিধা ছিল—কুলীন ব্রাহ্মণ বর অকুলীন ঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রলেই, তাঁর কৌলীন্য তাঁকে খোয়াতে হ'ত—তিনি কৌলীন্যের মর্য্যাদা হারাতেন, 'কুলীন' থেকে তিনি 'বংশজ' পর্য্যায়ে অবনীত হ'তেন। কিন্তু এই বংশজ হবার সঙ্গে-সঙ্গে, তিনি অকুলীন পিতাদের কুলীন জামাইয়ের শ্বশুর হবার জন্য আগ্রহের সুযোগ নিয়ে, একের পর এক ক'রে অনেকগুলি ক'রে বিয়ে ক'রে যেতেন। সমাজের মধ্যে এমনই যুক্তিহীনতা এসে গিয়েছিল যে এই বর্বর প্রথাকে সাধারণতঃ কেউ ঘৃণ্য মনে ক'রত না।

আমার প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র চাটুর্জ্যে মহাশয় এইরূপ কুলীন ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁর প্রথম নিবাস ছিল, শুনেছি ফরিদপুরের পাংশা গ্রামে। সেন-

রাজাদের আমল পর্য্যন্ত 'পঙ্গাবাস' নামে এই গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের এক প্রাচীন স্থান এই গ্রামটি। ইনি কৌলীন্যের বেসাতি করবার জন্য, কুলীন ব্রাহ্মণ এই বংশগৌরবটুকু সম্বল ক'রে, কালী-গঙ্গার দেশ অর্থাৎ ভাগীরথী নদী ও কালীঘাটের দেশে, আঁড়িয়াদহ বা এঁড়েদা গ্রামে, বড়ো নদী বা পশ্চিম বাঙলার দামোদরের পারের দেশ খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে, রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামের কাছে সিংটি-শিবপুর সোনাগাছি গ্রামে, আর অন্যত্র শ্বশুরদের আশ্রয়ে আস্তানা স্থাপন করেন। মহাকুলীন ভৈরব চাটুর্জ্যে মহাশয় ভাগীরথী-তীরে এসে কুল ভাঙলেন। অকুলীনের মেয়ে বিয়ে ক'রে আর নিকষ কুলীন রইলেন না, 'ভঙ্গ' হ'লেন, 'বংশজ' হ'লেন। খালি মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করা ছাড়া তাঁর আর কোনও দায়িত্ব ছিল না। আমার পিতামহ ভূমিষ্ঠ হন, সিংটি-শিবপুর সোনাগাছি গাঁয়ে তাঁর মাতুলালয়ে —উত্তরকালে 'দেশ' ব'লতে ছেলে বয়সে আমরা দামোদর-তীরের এই সিংটি-শিবপুর সোনাগাছিকেই বুঝ্‌তুম। আমার পিতামহ ৮৯ কি ৯০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই তাঁর জন্মের তারিখ ছিল খ্রীষ্টীয় ১৮১৬ কি ১৮১৭ সাল, আর সেই হিসাবে প্রপিতামহ মহাশয় এ অঞ্চলে আসেন সম্ভবতঃ ১৮১৬ সালের বছর কয়েক আগে। কৃতকর্মা ব্যক্তি, বিরাট্ কৌলীন্য-মর্য্যাদা, তাঁর পায়ে কন্যা সমর্পণ করবার জন্য, অসহায় কন্যার জীবনের সুখশান্তির বিনিময়ে পুণ্য বা অক্ষয় স্বর্গাকাঙ্ক্ষায় সমাজের নেতা অকুলীন ব্রাহ্মণ দেবতারা লালায়িত হ'তেন, আর তাঁদের অনুগৃহীত করবার জন্য, 'দরাজ হাতে' কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে, 'বাঙাল দেশ' থেকে আগত এই মহাকুলীন তাঁদের শ্বশুর-মর্য্যাদা দিতেন। এই ধরনের বহুবিবাহ-বিশারদ ভঙ্গ-কুলীনের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ে বইয়ে তাঁর সময়ে আর তার কিছু পূর্বে যতগুলি এইরূপ বিবাহ-বিশারদের নাম পেয়েছিলেন, তাঁদের একটা তালিকা প্রকাশ ক'রে দেন। আমার প্রপিতামহ কতগুলি বিবাহ ক'রেছিলেন, তা ঠিকমতো জানি না। তবে আমার পিতামহের মৃত্যুর পরে তাঁর শ্রাদ্ধে, আমার পিতা, বিশেষ ক'রে নিয়মভঙ্গ আর জ্ঞাতি-ভোজনের জন্য অনেক খুঁজে, পিতামহ মহাশয়ের মাত্র ৪।৫ জন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্ধান পান ও তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে ঠাকুমার কাছে কিছুটা বোধ হয় পাকা খবর পাই। আমরা তখন ৮।১০ বছর বয়সের ছেলে।

ঠাকুর্দা আর ঠাকুমা, বুড়ো বুড়ী দুজনে শেষ জীবন কাটাচ্ছেন, বাবা মা দেবতার আদরে তাঁদের রেখেছেন, আমরা নাতি-নাতনীরাও তাঁদের দুজনের স্নেহে মানুষ হ'চ্ছি। এঁদের দুজনের মধ্যে কখনও-কখনও একটু মতানৈক্যের জন্ত ঝগড়ার মতন হ'ত—কথা-কাটাকাটি—অত্যন্ত লঘু ব্যাপার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দাম্পত্য কলহ—খুদে-খুদে নাতি-নাতনীদের কাছে তা ছিল বিশেষ উপভোগ্য। একদিন শুনছি, ঠাকুমা কী কারণে চ'টে গিয়ে ঠাকুদ্দাকে গঞ্জনা দিচ্ছেন, তাঁর নিজের জোরদার খাঁটি বাঙলায়—"তোমাদের গুণপনার কথা আর ব'লো না—তোমরা যে 'ষাঠের বংশ'—তোমরা খালি মন্তর প'ড়ে বিয়ে ক'রতেই জানো—মাগ-ছেলের তত্ত্ব নেওয়া, তাদের দেখা-শুনো করা, ভাত-কাপড় দেওয়া—এসব তো তোমাদের কুষ্ঠিতে লেখে না।" আমরা বিপুল আগ্রহের সঙ্গে ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"হ্যাঁ ঠাকুমা, 'ষাঠের বংশ' ব'ললে, ওটা কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "তা জানিস না বুঝি? ওই যে তোদের ঠাকুদ্দা, ওঁর বাবা, আমার শ্বশুর ছিলেন যিনি, তিনি মহাকুলীন ছিলেন, তিনি ষাটটা বিয়ে ক'রেছিলেন। সব শ্বশুরবাড়ির নাম ঠিকানাও তাঁর মনে থাকত না, তাই একখানি খাতায় ক'রে লিখে রাখতেন। ষাটটি বিয়ে ব'লে তাঁর নাম হ'য়েছিল 'ষাট ফৈরব।'" শ্বশুরের, স্বামীর নাম সে যুগে মেয়েরা উচ্চারণ ক'রলে তাঁদের মহাপাপ হ'ত, তাই তাঁরা 'হরি'-কে 'ফরি', 'কালী'-কে 'ফালী', 'ভৈরব'-কে 'ফৈরব' ব'লতেন —আদ্য অক্ষরের জায়গায় 'ফ' বসিয়ে ব'ললে পরে পাপ হ'ত না। আমরা ঠাকুদ্দাকে জিজ্ঞেস ক'রলুম—"এ কী কথা শুনছি ঠাকুদ্দা? তোমার বাবা এই রকম ছিলেন?" ঠাকুদ্দা জবাব দিলেন—কিন্তু মনে হ'ল তাঁর জবাব তিনি তেমন জোর ক'রে দিতে পারছেন না—"না রে না, তোদের ঠাকুমার ওসব কথা শুনিস কেন?" আমরাও মজা পেয়ে ছাড়লুম না—"তবে ঠাকুদ্দা, তোমার বাবার কটা বিয়ে ছিল? ষাট না হ'লেও অনেকগুলো তো বটেই।" ঠাকুদ্দা ব'ললেন, "এই কত হবে? গোটা আষ্টেক দশ হয়তো হবে।" পরে এ বিষয়ে আমি একটু গবেষণাও ক'রেছিলুম—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক বইখানিতে তাঁর সংকলিত তালিকা দেখেছিলুম—বিয়ের সংখ্যা ধ'রে তিনি লিষ্টি ক'রে দিয়েছেন—হুগলী জেলার বসো গ্রামের ভোলানাথ বাঁড়ুজ্জে এই বহুবিবাহবিশারদ কুলীনদের অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁর নিজের খোঁজখবর মতন—তিনি মাত্র ৮০টি কন্যার স্বামী থাকতেও বৈধব্য ঘটিয়ে, তাঁদের পিতাঠাকুরদের

স্বর্গবাসের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।* তারপরে সংখ্যা ৭২, ৬২, ৫৬, ৫৫ এই ধরনে ক'মতে ক'মতে ৫ পর্য্যন্ত এঁদের নাম যা পেয়েছিলেন তা দিয়ে দেন।৬ এই তালিকায় আমার পূজ্যপাদ প্রপিতামহের নাম পাই নি। হয়তো তাঁর খবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে পৌছয় নি। অথবা তিনি সত্যি সত্যিই দশের উপরে ওঠেন নি—ঠাকুদ্দার অনুমান-ই ঠিক। এই সমস্ত কুলীন-পত্নীদের দুর্দশার কথা লিখ্‌বো না। বিনা দোষে, এক মূর্খ নিষ্ঠুর কুসংস্কারের ফলে, বহুপত্নীক উপার্জনাক্ষম যোগ্যতাবিহীন নিকম্মা এক পুরুষের গলায় তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত—যৌবনকালে পিতামাতার অবর্তমানে তাদের সম্মানের আশ্রয় অনেক সময়ে মিলত না। কেউ কেউ বিপথগামীও হ'ত, তাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না—বাপ মা বা অভিভাবক অনেক স্থলে একটু হৃদয়বান্ হ'লে, বহু চেষ্টা ক'রে মিথ্যা আচার ক'রে মাতামহ-গৃহে জাত এই-সব বিজাতক কুলীন পুত্রদের গ্রহণ ক'রতেন, গোলমাল হ'তে দিতেন না, সমাজে তারা চ'লে যেত, বাপের কুলমর্য্যাদার আবরণের মধ্যে।† তবে এরূপ ব্যাপার সমাজের মানুষের চোখ এড়ায় নি। 'কুলীন-পুত্র' শব্দটি অজ্ঞাতপিতৃক, 'বেজন্মা' বা বেশ্যাপুত্রের অর্থে ভদ্রসমাজের রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত হ'য়েছিল। একজন যাত্রা-দলের মালিককে তাঁর দলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'লেছিলেন—"পৌরাণিক কথার পালা লিখে দেন একজন অধ্যাপক পণ্ডিত, তিনি গানও বেঁধে দেন। বেহালা বাজান একটি জাত-বোষ্টম। ঢোলক বাজান একটি কায়স্থ সন্তান। পাঠ ব'লে ব'লে যান একটি ব্রাহ্মণ সন্তান। যারা গান গায়, যুড়ীর দল, দোহার, আর যারা নাটক করে, সব জাতের লোক আছে তাদের মধ্যে—বামুন, বদ্দি, কায়েত, তাঁতি, গন্ধবেণে। আর যে ৪।৫টা ছোঁড়াকে রাখতে হয়, রাজপুত্তুর সেজে যারা গানের আসর জমায়, সেগুলি সব 'কুলীন-পুত্র'।"

ঠাকুমার মুখে শুনেছি, তাঁর এক সৎ শাশুড়ী, আমার প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতমা পত্নী, নিরাশ্রয় হ'য়ে সপত্নী-পুত্র আমার ঠাকুদ্দার আশ্রয় নেন, ঠাকুদ্দা ঠাকুমা তাঁকে আপন মায়ের মতো যত্ন ক'রে ঘরে

* "স্বামী থাকতেও বৈধব্য ঘটিয়ে"—অর্থাৎ, এঁদের স্বামী বর্তমান থাকা সত্বেও, এঁরা স্বামীর সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হ'য়ে, পিতৃগৃহে কার্য্যতঃ বিধবার মতোই জীবন কাটাতেন।—অ।

† এরকম ঘটনার কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বইতেও আছে।—অ।

ঠাঁই দেন—কিন্তু তিনি নানা সংস্কারের ভারে জড়িত, তাঁর সমস্ত দাবি ঠাকুমাকে সইতে হ'ত। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, "তোর ঠাকুদ্দার এক সৎমা এলেন, তাঁর আর কেউ নেই—তাঁর পরিচর্য্যা সেবা যত্ন আমাকেই ক'রতে হ'ত, তাঁর বায়নাও ছিল খুব—আমাদের হেঁসেলে ছোঁয়াছুঁইর বাইরে তাঁর জন্য রান্নাবান্না ক'রে দিতে হ'ত। পরিবারের শিলনোড়ায় তাঁর বাটনা বাটা হ'ত না—তাঁর বাটনা বেটে দিতে হ'ত ঠাকুরঘরের চন্দনপীড়িতে। এতেও তাঁর মন পাওয়া যেত না, খুঁৎ খুঁৎ ক'রতেন। শেষে দর্পহারী নারায়ণ তাঁর দর্প টুকু খেলেন—তিনি পিছলে প'ড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে ব'সলেন, ন'ড়তে চ'ড়তে পারেন না, বিছানায় শুয়ে সব কিছু—বাহ্য পেচ্ছাপ নাওয়া-খাওয়া—সব আমাকেই করাতে হ'ত—মায়ের মতন তো, ফেলা যায় না। অনেক ভুগলেন, আমাদেরও ভোগালেন, তবে নিষ্কৃতি দিলেন।"

এই তো হ'চ্ছে কুলের ইতিহাস। কিন্তু এই কুসংস্কার গোঁড়ামি অজ্ঞতা নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে আদর্শনিষ্ঠা স্বার্থত্যাগ ভালোবাসা দয়ামায়া মানবিকতা দেখেছি—বিশেষ ক'রে সমাজের এই নিপীড়িতা মেয়েদের মধ্যে, তা মনে ক'রলে বুক ভ'রে ওঠে, চোখের জল বাধা মানে না—সব দোষ সত্ত্বেও আমার এই আধুনিক সর্বদোষের আকর হিন্দুসমাজকে এইরূপ দু পাঁচ দেবী-প্রকৃতির নারীর জন্মক্ষেত্র আর কর্মক্ষেত্র ব'লে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এই সমাজকে ভালো না বেসে পারি না। যত কিছু মন্দ জিনিস এর মধ্যে নিহিত আছে তা জেনেও, আমার ঠাকুমা, আমার মা, আমার অন্য অন্য বহু আত্মীয়াদের মতন পুণ্যচরিত মেয়েদের দেখে, একটা আনন্দময় গর্বসুখে কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে যায়। যাঁদের এ সৌভাগ্য হ'য়েছে, তাঁরা নিজেদের সমাজের শত অপরাধ উপেক্ষা ক'রে, সমাজের এই সর্বত্যাগী স্নেহময়ীদের কথা ভেবে এই সমাজকে ভালো না বেসে পারেন না—বাইরের থেকে শত জোর হাওয়া এলেও, সহস্র মানসিক আত্মিক সাংস্কৃতিক টান এলেও, শেষটায় এই সমাজকে আঁকড়ে থাকতেই ভালো লাগে। মনে হয়, এ যুগের বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রভাত মুখুজ্যে, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, সকলের মধ্যে ঘর আর বা'র দুটোরই মাঝে যাঁদের পরিচয়, তাঁদের সকলের সম্বন্ধেই একথা বলা যায়।

ঘরের কথা, আশপাশের কথা, যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ'য়ে উঠেছি,

তার কথা এইবার একটু বলা যাক। সব জাতের মানুষই মানুষ ব'লে সমান, বামুন ব'লে বিশেষ ক'রে অব্রাহ্মণ কেউ যদি আমাদের একটু খাতির ক'রতে চাইত বা সম্মান দেখাত,—হিন্দু সমাজ থেকে বামনাইয়ের কদর এখন উচিত-ভাবেই বিদায় নিচ্ছে, কারণ ব্রাহ্মণের যে-সব গুণের জন্য আগেকার কালে লোকে তাঁদের মান্য ক'রত, যুগধর্মের প্রভাবে সে-সব গুণ এখন লোপ পাচ্ছে, লোকের অন্ধবিশ্বাসে বামুনের মধ্যে জন্মগত অধিকারের জন্য সে-সব গুণ কিছুটা অন্ততঃ সুপ্ত থাকত ব'লে এই খাতিরটুকু হ'ত,—আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগ্‌ত না। যেমন বাস্তবিকই একদিন একটা মানসিক আঘাত পেয়েছিলুম—একটা যাত্রার আসরে ঠাসাঠাসি, ভীড়ের মধ্যে ব'সে যাত্রা শুন্‌ছি, এমন সময়ে আচম্‌কা আমার পাশে বসা একটি আধবুড়ো ব্যক্তির পা-টা আমার গায়ে লাগে, তাকে দেখে মনে হ'ল কারিগর শ্রেণীর মানুষ, সে তো চ'ম্‌কে গিয়ে আমায় ব'লে উঠ্‌ল, "খোকাবাবু, তোমরা বামুন?" আমি "হাঁ" বলায় সে তখনি উঠে, বয়স্ক লোক, আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রলে, আর ব'লে উঠ্‌ল, "খোকা, আমি মহাপাপী, তোমরা বেরাম্মন, তোমার গায়ে পা লাগ্‌ল, আমার পাপ হ'ল, বাবা তুমি আমায় ক্ষমা করো।" আমার মনে খুব আশ্চর্য্য ভাব এল, তবে সবটা বুঝলুম না, আর বামুন ব'লেই এই প্রণাম পায়ের ধুলো নেওয়া, পাপ মনে করা, কী রকম যেন লাগ্‌ল।

আবার ওদিকে, গোঁড়ামির বশবর্ত্তী না হ'য়ে, সহজভাবে ঠাকুদ্দা ঠাকুমা ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে ব'লেই যে সদাচার শেখাতেন, সেটাও ভালো লাগ্‌ত। আমি যে ব্রাহ্মণ, দুদিন পরে আমার পৈতে হবে, তখন আমায় কতকগুলি নিয়ম মেনে চ'লতে হবে, আর-সব ঘরের ছেলের মতো নয়, কতকগুলি বিষয়ে আমায় আত্মদমন ক'রে চ'লতে হবে, এ বোধটাও একটু আনন্দ দিত। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একটু আত্মপ্রসাদ আত্মতৃপ্তি আর অজ্ঞাতসারে দম্ভভাবও ছিল। যেমন ঠাকুদ্দা ব'লতেন, "হিঁদুর ঘরে জ'ন্মেছ, ব্রাহ্মণ ব'লে সকলে মান্য করে, তার যোগ্য হওয়া চাই। সকালে উঠে বাসিমুখে খাবে না—মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে তবে খাবার কথা চিন্তা ক'রবে। ভাত খাবার সময়ে ভাতের সঙ্গে দাল তরকারি যখন মাখ্‌বে, পরিষ্কারভাবে তা ক'রবে, হাতের চেটো কব্‌জি পর্য্যন্ত ভাত-তরকারি মাখিয়ে নোংরা ক'রবে না, চুন-সুরকির তাগাড় মাখার মতো—আঙুলের দুটি পাবের উপরে যেন ভাত-তরকারি মাখামাখি না হয়। আল-

গোছা জল খেতে শেখো ; খাটন-মালা হ'য়ে ব'সে খাবে।" ঠাকুমা ব'লতেন —"এঁটো ক'রে গেলাস থেকে জল খেলে, গেলাসটা ধুলে না? বামুনের ঘরে জ'ন্মেছ কেন—সে কথা মনে থাকে না?"

পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে গৌরবের অনেক কিছু আছে। তার বেশিটা হ'চ্ছে বিদ্যা নিয়ে, তাঁদের অনেকের চারিত্রিক বল নিয়ে, তাঁদের সহজ দয়ামায়া আর মানুষের কল্যাণচিন্তা নিয়ে। আমাদের ঘরের কান্যকুব্জাগত দক্ষ থেকে আমি পর্য্যন্ত এই আটাশ পুরুষের যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে বেশ পণ্ডিত ছিলেন ক'জন, তা তাঁদের নাম থেকে বোঝা যায়। যেমন এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন সুলোচন, যিনি রাজার কাছে গ্রাম পেয়ে 'চাটুজ্জে' গাঁইয়ের আদিপুরুষ হন। সপ্তম পুরুষ ছিলেন অধ্বর্য্যু শ্রীকর—বৈদিক যজ্ঞ ক'রে তাঁর এই সম্মানীয় উপাধি। দশম পুরুষে অবসথী সর্বেশ্বর—বাড়িতে টোল ক'রে বিনা ব্যয়ে ছাত্র পড়াতেন—তিনি হুগলী জেলায় দেশমুখা গাঁয়ে বাস করেন। এগারো পুরুষে অবসথী তেকড়ি। পনেরো পুরুষের ছিলেন পরাশর, তাঁর ছোটো ভাই জগন্নাথের বংশে পরে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সপ্তদশ পুরুষে অবসথী রবিকর চাটুর্জ্যা, ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বানন্দী-মেলের বা বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর পুত্র বিষ্ণু শিকদার বরিশালের ঝালোকাঠি পরগনায় মুসলমান সুলতান সরকারে চাকরি নেন। বিষ্ণু শিকদারের তিন কৃতবিদ্য পুত্র ছিলেন— তাঁদের মধ্যে যাদব সার্বভৌমের বংশের আমরা। পঁচিশ পুরুষে প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালদেশ ছেড়ে ভাগীরথী-তীরে আসেন, কুলীন থেকে ভঙ্গ হন। পিতামহ (২৬ পুরুষ) ঈশ্বরচন্দ্র, জীবৎকাল আনুমানিক ১৮১৬ থেকে ১৯০৬—ইনিই ক'লকাতায় বসবাস করেন। বাহির সিমুলিয়া চালতাবাগান পল্লীতে সুকিয়াস্ স্ট্রীটে ভদ্রাসন বাটী তৈরি ক'রে থিতু হন।

ঠাকুদ্দার জীবনের ইতিহাস ঠিকমতো জানি না। শুনেছি, তিনি ফারসি আর ইংরিজি পড়েন, তারপরে ক'লকাতায় কোনও ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানির

'হৌসে' বা আপিসে কেরানির কাজ নেন। এই রকম একটা কোনও হৌসের চাকরি নিয়ে পশ্চিম অঞ্চলে কয়েক বৎসর কাটিয়ে আসেন, কোথায়, কোন্ সময়ে তা জানতে পারি নি। মিউটিনির সময়ে নাকি পশ্চিমেই ছিলেন। তার পরে ক'লকাতায় ফিরে এসে আবার এক সাহেব কোম্পানির আপিসে ঢোকেন। সিংটি-শিবপুর সোনাগাছিতেই তাঁর জন্ম হয়, সেখানেই বিয়ে হয়। ঠাকুমা যাদুমণি দেবীর বাবা কার্ত্তিকচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে ঐ অঞ্চলে সংগতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ঠাকুদ্দা ক'লকাতায় এসে কিছুকাল সুকিয়াস্ স্ট্রীট (এখনকার 'কৈলাস বসু স্ট্রীট') আর আমহার্স্ট স্ট্রীট (এখনকার 'রাজা রামমোহন সরণি')-এর সংযোগস্থলে, সুকিয়াস্ স্ট্রীটের উপরে যে শিবমন্দির আছে (মহেশ ঘোষ বা ময়শা গয়লার মন্দির নামে পরিচিত*), তার পুবে রমাপ্রসাদ রায়ের লেনে বাস করেন, শুনেছি সেই বাসায় বাবা জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরে ঠিক কোন্ সময়ে জানি না, তখন বাবা কিছুটা বড়ো হ'য়েছেন, ঠাকুদ্দা বা'র সিমলে চালতাবাগান পাড়ায় আড়াই কাঠা জমি কিনে তাঁর আপনার বসতবাটী ভিটের পত্তন করেন। আড়াই কাঠা জমিতে দুখানি কাদার গাঁথুনি ইটের ঘর, মায় পাকা ছাত, এই দুখানি ঘরের সামনে একটু লম্বা দালান, তার গ'ড়েন খোলার চাল, আর তার সামনে আর একখানি ছোটো পাকা ঘর, আর একটি খোলার চালের ঘর—আর তা ছাড়া ইটের দেয়াল খোলার চালের ছাত আর একখানি ছোটো 'বাইরের ঘর'ও তৈরি সদর দরজার পাশে। বাড়ির মধ্যে বেশ একটু জায়গা খালি ছিল, সেখানে পেয়ারা করবী প্রভৃতি দু চারটে গাছ ছিল, একটা খোলার চালের গোয়াল-ঘরও ছিল। এই নিয়ে এই বাড়ির পত্তন, যেখানে আমি আমার জীবনের ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৪৩ বৎসর কাটাই। পরে এই বাড়ির সবটাই পাকা হয়, দোতলা হয়। এখনও আমার মনে অনেকটা অস্পষ্টভাবে হ'লেও এই বাড়ির ছবি মুছে যায় নি। এ-সব ছাড়া, আরও একটা জিনিস বা'র বাড়ির খালি জায়গাটুকুতে ছিল, সেটাও বেশ মনে প'ড়ছে —চারটে শক্ত কাঠের পায়া বা খোঁটার উপরে দুটো মোটা কাঠের বার— 'প্যারালেল বার', সবুজ রঙ করা—বাবা ছেলেবেলায় এই বারে ব্যায়াম ক'রতেন, আমরাও পরে ক'রেছি। এর একটু ছোটো ইতিহাস আছে, পরে ব'লছি। †

---

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "শৈশব-স্মৃতি"।—অ।

† সে "ছোটো ইতিহাস" আর বলা হয় নি।—অ।

১৮৬০ সালের দিকের কথা, এখন থেকে একশ' বছরের আগেকার সময়, আমি তো জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে এই বাড়িই দেখে এসেছি, এর মধ্যে মানুষ হ'য়েছি। সে-সব দিন-কাল, আবহাওয়া সবই আলাদা ছিল। বিলিতি সওদাগরি আপিসে কেরানির কাজ ক'রে ১০০ টাকারও কম মাইনে পেয়ে, বাড়িটুকুন ক'রে এই একশ' বছর আগে সংসার চালাতেন। বাড়িতে আমার ঠাকুমা, একমাত্র ছেলে আমার বাবা, ৪।৫টা মেয়ে, এঁরা আমার পিসি, এঁদের নিয়েই সংসার। মাঝে মাঝে 'দেশ' থেকে আত্মীয়-সমাগম হ'ত, এঁদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ত বাইরের ঘরে। বড়ো পিসি ক্ষেত্রমণি দেবীকে দেখি নি—বেলঘরের যোগীন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জে ছিলেন আমার বড়ো পিসেমশাই, এঁদের ছেলেদের—উপেনদা, ফণীদা, জ্ঞানদা—এঁদের ছেলেবেলা থেকেই বেশ জানতুম—এঁরা আমাদের ভালোবাসতেন—খালি ফণীদার মৃত্যু হ'য়েছিল খুব কম বয়সেই, ফণীদার বিয়ে হ'য়েছিল ক'লকাতায় কম্বুলেটোলায়, সেই বউদির স্নেহ আমরা কিছু কালের জন্য আমাদের মায়ের মৃত্যুর পরে আমাদের বাড়িতে পেয়েছিলুম।

উপেনদা বাবার চেয়ে ৪।৫ বছরের ছোটো ছিলেন, কিন্তু তিনি বাবার বন্ধুর মতোই ছিলেন, তিনি পরে, তখনকার দিনের ক'লকাতার বিখ্যাত হোটেল-ওয়ালা আর বিলিতি খাদ্যদ্রব্যের দোকানি G. F. Kellner কোম্পানির, যাদের উত্তর-ভারতের সমস্ত রেলগাড়ির আর রেলস্টেশনের রেস্তোরাঁ চালাবার একচেটে কারবার ছিল, তাদের ক'লকাতার প্রধান আপিসের বড়োবাবু হ'য়েছিলেন। স্বগ্রামের অনেকগুলি ভদ্রসন্তানের চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন, আর আদর্শ পিতৃভক্ত পুত্র ছিলেন। কতকগুলি ছেলেপুলে রেখে আমার পিসিমার মৃত্যুর পরে, পিসেমশাই, তাঁর পিতাঠাকুর, আবার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানদের উপেনদাদা আপন মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন দেখতেন। উপেনদাকে ছেলেবেলা থেকেই আমরা অশেষ শ্রদ্ধা ক'রতুম, সমাজের মধ্যে আমরা সকলে তাঁকে আদর্শ পুত্র ব'লেই মনে ক'রতুম। কম বয়সেই আমাদের বৌদি মারা যান, উপেনদা আর বিয়ে করেন নি, কিন্তু ভাইয়েদের আর অন্য আত্মীয়দের অনুচিত ব্যবহারে, আর দুই ছেলের মধ্যে

অবনিবনা ও একটি নাতির মানসিক বিকারে ও অসুখ-বিসুখে নানা দুঃখ পান, চুপ ক'রে মুখ বুজে সব সহ্য করেন—পরের জন্য নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জন-দেওয়া এমন মানুষ পাওয়া যায় না। আমার মেজোপিসিমা কান্তমণি দেবীর বিয়ে হ'য়েছিল এক ডাক্তারের সঙ্গে, কিন্তু তিনি কম বয়সেই যক্ষার রোগী দেখ্‌তে গিয়ে তাঁর ছোঁয়াচে ঐ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, আর তাঁর দুই ছেলে সুরেনদা আর ভূতোদা, মেয়ে সুশীলা দিদি, সুরেনদার ছেলে অনাথ, সুশীলা দিদির দুই সন্তান মেয়ে কাজল আর ছেলে পটল—এই দুই পুরুষের এত-গুলি প্রাণী ঐ কালরোগের কবলে পড়ে। এদের মধ্যে ভুতোদাকেই বেশ মনে পড়ে—সুন্দর চেহারা, ডাগর চোখ, ভূতোদা আমাদের বাড়িতে, মেজোপিসিমা যে পাকা ঘরটি তৈরি ক'রে দেন, সেই ঘরে থাকতেন, ছোটো মামাতো ভাই আমি তাঁর খুব নেওটো ছিলুম—আমায় তাঁর বইয়ের ছবি দেখাতেন। অতি শিশুকালের এটি একটি আনন্দের স্মৃতি। কিন্তু একে একে পতিপুত্রকন্যাহীন হ'য়ে পিসিমার প্রকৃতি বিষিয়ে ওঠে। তিনি ভয়ানক ঝগড়াটে আর কুঁদুলে হ'য়ে ওঠেন। দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মেয়ে ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর স্মৃতি এই যে, যার উপরে তাঁর রাগ হ'ত চীৎকার ক'রে আঙুল ম'টকে ম'টকে তার মৃত্যু কামনা ক'রে গালি দিতেন। তাঁর আপন ভাই, আমার বাবা, তাঁর প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ক'রে দেন, এমন কি প্রতিজ্ঞা ক'রে তাঁর পয়সায় তৈরি ঘরখানির ভিতরে কখনো যেতেন না। কয়েক বছর আমাদের বাড়িতে থেকে তিনি জোর ক'রে বাড়িঘর বাপ-মাকে ছেড়ে কাশী-বাস ক'রতে গেলেন। তিনি ব'লতেন—"কারো তোয়াক্কা রাখি না—কাশী গিয়ে বিশ্বনাথের দরজায় মাথা গোঁজ্‌বার একটা ঠাঁই ক'রে নেবো, একখানা সতরঞ্চি মুড়ে তার আধখানার উপর শোবো আর আধখানায় শীত নিবারণ ক'রবো।" ঠাকুদ্দা তাঁকে এভাবে ছেড়ে দেন নি, কাশীতে নিয়ে গিয়ে একটা বড়ো বাসায় একটি কামরা ভাড়া ক'রে রেখে আসেন, আর মাসে মাসে তাঁকে ছটি ক'রে টাকা পাঠাতেন (তখন ঠাকুদ্দা বেকার, বয়স হ'য়েছে, সে টাকা বাবাই তাঁর স্বল্প বেতন থেকে দিতেন)—শস্তাগণ্ডার দিনে তখন ঐ টাকাতেই চ'লত—আট আনা কি বারো আনা ঘর ভাড়া, বাকি পাঁচ টাকায় একজন ভদ্র ব্রাহ্মণঘরের বিধবার চ'লে যেত।

তখন টাকা দেড়েক ছিল চা'লের মণ, গম আরও শস্তা, দু-তিন পয়সার শাকসব্জিতে একজনের চ'লে যেত, দু পয়সায় ছোটো এক ভাঁড় মালাই। পরে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, পিসিমার মাসহারাও বাবা বাড়িয়ে দেন, বোধ হয় দশ টাকা হয় শেষে—আর পিসিমার আগ্রহে বাবা কাশীর বাঙ্গালীটোলার গলির মধ্যে ছোট্ট আধ-কাঠার মতন জমিতে দেড়খানি ঘরওয়ালা একটুকরো দোতলা পাথরের বাড়ি কেনেন, ১৩০০ টাকার ভিতরে, তাতেই পিসিমা পরে বাস ক'রতেন। সেই বাড়িতেই তাঁর কাশী-লাভ হয়। আমার ষোলো বছর বয়সে—তখন আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই নি—আমি একবার কাশী যাই। রেলের থার্ড ক্লাস ভাড়া বোধ হয় তখন ৩ টাকার মধ্যে ছিল। কাশী তখন অদ্ভুত সুন্দর লেগেছিল, আর পিসিমা তখন ভাইপোকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পান—দিন পনেরো কুড়ি ছিলুম—কাশীর সমস্ত ঘাট মন্দির দ্রষ্টব্য স্থান মায় নৌকো ক'রে কাশীর রাজার বাড়ি ব্যাসকাশী সব কিছু খুঁটিয়ে দেখান। পিসিমাকেও কোন্ শিশুকালে দেখেছিলুম—আবার দেখলুম—তিনি তখন খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির হ'য়েছেন। পরে আবার ক'লকাতায় এসেছিলেন, আমাদের বাড়িতে ছিলেন, ঠাকুমা তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়*, ঠাকুদ্দা দেহত্যাগ ক'রেছেন—আমার বিবাহও হ'য়ে গিয়েছে, ১৯১৪ সালের পরে। অন্য আত্মীয়স্বজনকে বরদাস্ত ক'রতে পারতেন না।

আমার ছোটো পিসিমা বিনোদিনী দেবী বাবার চেয়ে বেশি বড়ো ছিলেন না। ছোটো পিসেমশাই দুর্গাপদ ঘোষাল সেকালের রুড়কীর পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—সরকারি কাজ ক'রতেন, কোম্পানির রাজ্যে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, জীবনের বেশির ভাগ পশ্চিমে পাঞ্জাবে আর উত্তর প্রদেশে কাটান, আসামে গৌহাটিতে আর অন্যত্রও ছিলেন। শেষ বয়সে অবসর গ্রহণ ক'রে ক'লকাতায় ৯৬নং গড়পার রোডে বাড়ি ক'রে বাস করেন। সেখান থেকেই তাঁর চার ছেলে পড়াশুনো ক'রে মানুষ হন—আমার চার পিস্তুতো ভাই—দেবেন্দ্রনাথ (ইনি ডাক্তারি পাস ক'রে উত্তরকালে জীবনের বেশির ভাগ ব্রিটিশ মালায়াতেই কাটিয়ে দেন), মহেন্দ্রনাথ (কেমিস্ট্রিতে এম-এ পাস ক'রে

* সুনীতিকুমারের পিতামহী যাদুমণি দেবী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর "প্রায় ৯২ বছর বয়সে" দেহরক্ষা করেন।—অ।

মজফ্‌ফরপুরে ওকালতি করেন), ভূপেন্দ্রনাথ (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি-বিষয়ে পাস ক'রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন), আর উপেন্দ্রনাথ (ইতিহাসে এম-এ পাস ক'রে বাঙলা সরকারের শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপকের কাজ করেন, ক'লকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বহু বৎসর অধ্যাপনা করেন, ঐ কলেজে ওঁর ছাত্র আমি ছিলুম—প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ কতকগুলি ভালো বইও তিনি লেখেন*)। ছোটো পিসিমার তিন মেয়ে ছিল নগেন্দ্রবালা, বীরেন্দ্রবালা, স্বরেন্দ্রবালা—আমার বাল্যস্মৃতির অনেকখানি আমার মামার বাড়িতে মাস্‌তো ভাইবোনদের সঙ্গে এই পিস্‌তো ভাইবোনেরাও জুড়ে ছিল।

জীবন-কথা পত্তন করবার সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর্দা ঠাকুমা বাবা আর মা'র সম্বন্ধেও কিছু বলি। এঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত (কতকটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত) বাঙালী ভদ্র পরিবারের মানুষ ছিলেন, এই মধ্যবিত্ত সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যেই তাঁদের জীবনচর্য্যা সীমায়িত ছিল। এই সমাজের দোষ গুণ মহত্তা ক্ষুদ্রতা সবই তাঁদের ছিল। কিন্তু তা ছাড়া, জ্ঞান হওয়া থেকে যা দেখে এসেছি, তাঁদের মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ সহজ সদ্‌গুণও ছিল, সেগুলির জন্য তাঁদের সাধনা ক'রতে হয় নি—আর সেই-সব গুণের জন্য তাঁদের বার বার অসংখ্য প্রণাম করি। আমার মধ্যে যদি কিছু ভালো বা প্রশংসার যোগ্য থাকে, মানসিক নৈতিক দিক থেকে, সে সমস্ত তাঁদেরই কৃপায় আর তাঁদের নির্বাক্ শিক্ষায় আর দৃষ্টান্তেই পেয়েছি। ঠাকুরদাদা মশাই দীর্ঘকায়, প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি, গৌরাঙ্গ, বেশ সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় ফারসি প'ড়েছিলেন, সংস্কৃতও কিছু জান্‌তেন, আর ইংরিজির classics কিছু কিছু প'ড়তেন—যেমন Oliver Goldsmith-এর গদ্য আর পদ্য রচনা, Shakspere-এর রচনা, ইংরিজিতে Arabian Nights, বিজ্ঞান আর ইতিহাসের ছোটো ছোটো বই ; এ-সব বইয়ের একটি ছোটো সংগ্রহ তাঁর হাতে বাড়িতে গ'ড়ে উঠেছিল, ছেলেবেলায় তা দেখেছি। আর বাঙলা সাহিত্যেও তাঁর প্রীতি ছিল—নিয়মিতভাবে তিনি 'জন্মভূমি' পত্রিকা নিতেন। বঙ্গবাসীর সংস্করণ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বাঙলা অনুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত, কিছু কিছু অন্য পুরাণের অনুবাদ, আর অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণে কবিকঙ্কণ চণ্ডী আর বৈষ্ণব পদাবলী, আর তা ছাড়া নববিধান সমাজের গিরিশচন্দ্র সেনের

* এঁর জীবৎকাল ১৮৮৬-১৯৬৯।—অ।

বাঙলা 'তাপসমালা' (তজকিরাৎ অল্‌-আউলিয়া)—এই রকম কতকগুলি বই তাঁর ছিল। তিনি পশ্চিমে কবে কোথায় ছিলেন, কী কাজ ক'রতেন জানি না। স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন, আর রেগে গেলে চোস্ত হিন্দুস্থানী গালিগালাজ ক'রতেন, বকতেন। ক'লকাতায় Ewing কোম্পানির হাউসে কেরানির কাজ ক'রতেন, পরে চোখে ছানি পড়ে, সে কাজ ছেড়ে দেন। আমাদের শিশুকালে তিনি আমাদের পড়া ব'লে দিতেন, ইংরিজি পড়াতেন, আর ব'লতেন—"খুব চেঁচিয়ে ইংরিজির 'মতন' প'ড়বি।" 'মতন' শব্দটির মানে কী বহু দিন ধ'রে জানতুম না, তাঁকে জিজ্ঞাসাও করি নি—পরে যখন কলেজে প'ড়তে প'ড়তে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রস পেলুম, তখন জানলুম যে 'মতন' মানে 'মূল পাঠ—text'। আর বহু সংস্কৃত নীতিশ্লোক তিনি মুখে মুখে আমাদের শিখিয়েছিলেন।

ঠাকুমার কাছে ঠাকুদ্দার চোখে ছানি পড়ার, আর দেশী গাঁয়ের ছানি কাটার বৈদ্য 'মাল'-জাতীয় লোকের হাতে চিকিৎসা আর শেষে অস্ত্র ক'রে সেই ছানি কাটার বর্ণনা শুনি। এটি বোধ হয় ১৮৬৮।১৮৭০-এর কথা।

চোখে ছানি হওয়ায় তিনি অকর্মণ্য হ'য়ে যান, আপিসের চাকরিও ছাড়তে বাধ্য হন, বেকার অবস্থায় চরম দুরবস্থায় পড়েন। যা সঞ্চয় ছিল, তা থেকে চিকিৎসা করান। মালবৈদ্যরা আসুরিকভাবে চিকিৎসা ক'রত। 'নস্তর্' অর্থাৎ অস্ত্র করবার সময়ে রোগীকে অচৈতন্য করবার বালাই তখন ছিল না, আর local anaesthesia, অর্থাৎ দেহের যেখানে অস্ত্র করার ছুরি বা শলা চ'লবে, ওষুধ দিয়ে সে জায়গাটা অসাড় করার উপায় তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। পাড়াগেঁয়ে মালবদ্দি এলেন, তাঁর পারিশ্রমিক ঠিক হ'ল, কয় গণ্ডা টাকা, আর রোগী অস্ত্র করার পরে দেখতে পেলে ধুতি চাদর। ষণ্ডা জোয়ান চেহারার লোক, একটা সেকেলে ক্যাম্বিসের ব্যাগে তাঁর যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্র জড়ি-বুটি, আর দুজন সহকর্মী, এঁরাই যেন আজকালকার anaesthetic assistant, রোগীকে ক্লোরোফর্ম করবার মতন কাজ এঁরা ক'রবেন। বেশ বলবান্ দুই বাগ্‌দি জোয়ান। রোগী তো অস্ত্র করবার আগে ভীষণ আতঙ্কিত হন। হবারই কথা। তাঁকে আগের দিন খুব হাল্‌কা কিছু খাওয়ানো হয়। অস্ত্রের সময় ঐ দুই ষণ্ডামার্কা সহকর্মী রোগীকে বিছানায় শুইয়ে তাঁর হাত-পা এমনভাবে ধ'রে

রইল যে তাঁর নড়বার চড়বার শক্তি রইল না। আর শল্য-চিকিৎসক মাল মহাশয় রোগীর মাথা কোলে নিয়ে, দুই হাঁটু দিয়ে এমন ক'রে চেপে ধ'রলেন যে, তিনি একেবারে অসাড় হ'য়েই রইলেন, যেন বড়ো সাঁড়াশি দিয়ে তাঁর মাথাটা চেপে ধরা হ'য়েছে। সেই অবস্থায়, একটা নরুনের মতন ছুঁচালো-মুখ লোহার শলা দিয়ে, বাঁ হাতে রোগীর থুতনি কামারের লোহার যন্ত্র vice (বাইসের) মতন জোরে ধ'রে, 'মোতিয়া বিন্দ্' অর্থাৎ চোখের তারায় ফুটিয়ে দিয়ে নাড়া দিলেন। এই হ'ল operation বা অস্ত্রোপচার। ছানি অর্থাৎ চোখের উপরে যে একটা আবরণ পড়ে, এইভাবে নাড়া খেয়ে প'ড়ে যেত। ছুঁচ ফোটাবার সময়ে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়েও রোগী দাঁতে দাঁত চেপে থাকত। প্রাণ গেলেও মাথা নাড়াত না—মাথা নাড়ালেই ছানি ছিঁড়ে ছড়িয়ে প'ড়বে আর চোখের দৃষ্টিশক্তিও চিরতরে চ'লে যাবে এই মারাত্মক আশঙ্কায়। রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় কোনও রকমে চুপ ক'রে আছে, চোখ থেকে রক্তপাত হ'চ্ছে,—তখন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মাল মহাশয়, কতকগুলি তাঁদের ওষুধের গাছের পাতা বেটে রেখেছিলেন, সেগুলি চোখের উপরে কলাপাতা দিয়ে প্রলেপের মতো ক'রে লাগিয়ে দিলেন, তার পরে বেশ শক্ত অথচ আলগা ক'রে কাপড়ের পটি বেঁধে দিলেন চোখের মাথার কপালের উপরে। হুকুম হ'ল, তিন দিন মাথা একেবারে যাতে না নড়ে, রোগী যেন কথা না বলে, আর যেন হাঁচি দমন ক'রে থাকে। তিন দিন পরে মাল মহাশয় এসে চোখের পটি খুলে দিলেন, তার পরে চোখের সামনে নিজের আঙুল তুলে ধ'রে নাড়তে লাগলেন, রোগী কিছু দেখতে পাচ্ছে কি না। কিছু দৃষ্টিগোচর হ'লে, বোঝা গেল যে অস্ত্র করা সার্থক হ'য়েছে। তার দু-চার দিন পরে, চোখের ফুটোর ঘা শুখোলে, মুসলমান চশমাওয়ালার দোকানে গিয়ে, এ চশমা সে চশমা দেখিয়ে, যাতে প'ড়তে পারা যায় আর লোক চেনা যায়, এমন মোটা পরকলার কাচের চশমা কেনা।

এইভাবে ঠাকুদ্দা তাঁর ছানি-পড়া চোখ ফিরে পান।

পড়বার সময়ে চোখে চশমা প'রতেন, মাঝখানটা খুব মোটা কাচের পরকলা। আর সেই সময় থেকেই তিনি এক কবিরাজি ওষুধ ধ'রলেন, কপালে মালিষ ক'রতেন, মহাদশমূল তেল। সবুজ রঙের চটচটে তেল, একটা দুর্গন্ধ

মতো—প্রায় সব সময়েই কপালে ঘ'ষতেন। চোখ ফিরে পাওয়ার বহু দিন পরে, আমি যখন ৭।৮ বছরের হ'য়েছি, তখনও ঠাকুদ্দার আগ্রহ ছিল, সংসার চ'লছে স্বল্প মাইনের অ্যাপ্রেণ্টিস্ কেরানি আমার বাবার রোজগারের উপরে,—ঠাকুদ্দাও সেই বুড়ো বয়সে বাবার সাহায্য করবার জন্য নোতুন ক'রে মাঝে মাঝে কেরানি-গিরি চাকরির চেষ্টায় দরখাস্ত দিতেন। তাঁর নিজের টানা-হাতে তাঁর লেখা দরখাস্ত দেখেছি—ইংরেজ হাউসওয়ালাদের কতার কাছে লেখা মামুলি গৎ—Being given to understand that you require some clerical hands in your office, I beg to offer myself as a candidate for one of these posts. As regards my qualifications, I have the honour to state that I have a good knowledge of general clerical work, including accounting, and I have a neat hand for writing English (তখনকার দিনে টাইপ-রাইটার ছিল না, হাতের লেখাতেই চিঠিপত্র নকল হ'ত—নকল-নবীশ কেরানির চাহিদা ছিল). Should you be pleased in your kindness to think me suitable for the post, I shall be in duty bound to try my very best to give you all satisfaction in my work. I have the honour to be, Sir, your most obedient servant. এই ছিল বাঁধা গৎ, এবং ইস্কুলের ছেলেদের হাতের লেখায় এটা কন্ত করাবার জন্য শেখানো হ'ত। ঠাকুদ্দা তাঁর নামের ইংরিজি বানান এই রকম লিখতেন, Issur Chundra Chatterjee—দুটি ss টানা লম্বা অক্ষরে এমনভাবে লিখতেন, সে যুগের হাতের লেখার কায়দা মতো—যেন ff-এর মতো দেখাত। ঠাকুদ্দা বাবার কাছে লুকিয়ে এই সব দরখাস্ত নিয়ে তাঁর চেনাশুনো বন্ধুদের আপিসে মাঝে মাঝে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ক'রতেন। বাবা জানতে পেরে রাগ ক'রে দুঃখু ক'রে ঠাকুদ্দার কাছে অভিমানের সঙ্গে অনুযোগ ক'রে, এমন কি কতকটা যেন ধ'মকে অনর্থ ক'রতেন।

একদিনের কথা মনে আছে—বাবা ব'লছেন, "আমি তো বেঁচে র'য়েছি এখনো, তুমি এই বুড়ো বয়সে ছানি-কাটা চোখ নিয়ে এ-আপিস সে-

আপিস ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে চাকরির জন্য হা-পিত্যেশ ক'রে—আমি তো মরি নি, দিনান্তে একমুঠোর সংস্থান ক'রে যদি আনতে পারি, তা হ'লে তোমায় আধমুঠো দিয়ে তবে আমরা খাবার কথা ভাব্‌বো—আমি থাকৃতে তুমি যদি চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াও, তাতে তুমি আমার কত অকল্যাণ করো তা বুঝ্‌তে পারো না।" ঠাকুর্দা এই-সব কথা শুনে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে প'ড়তেন, একটু হাঁ-না ক'রতেন—শেষে চাকরির চেষ্টায় ঘোরা একেবারেই ছেড়ে দিলেন।

বাবা জন্মগ্রহণ করেন ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ সাল, ইংরিজি ১৮৬২ সালে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ইংরিজি ১৮৬১, স্বামী বিবেকানন্দের ইংরিজি ১৮৬৩ সালে। সুতরাং বাবা এই দুই মহাপুরুষের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বামীজীকে ছেলেবেলায় তিনি জানতেন, কতকটা এক পাড়াতেই বাস ছিল—একথা পরে ব'লছি।* রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটু বড়ো বয়সে দূর থেকে দেখেছিলেন, কিন্তু কখনও আলাপ পরিচয় হ'তে পারে নি। বাবার জন্ম হ'য়েছিল বোধ হয় রমাপ্রসাদ রায় লেনের ভাড়াবাড়িতে, তবে ছেলেবেলা আর সারা জীবন তাঁর কাটে সুকিয়াস্ স্ট্রীটের লাগোয়া উত্তর দিকে একটা সরু গলিতে ঠাকুর্দার তৈরি ছোটো বাড়িটিতে—আমাদের সত্যকার পৈতৃক ভিটেয়। প্রথমটায় এই বাড়ির নম্বর ছিল ৬৪ নম্বর সুকিয়াস্ স্ট্রীট, এই বাড়ির পিছনের খিড়কি দরজাটাই তখন ছিল সদর দরজা। পরে যখন বাড়িখানির পশ্চিম দিকে সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে একটি সরু গলি বেরুলো, সেই গলির নাম হ'ল 'নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন'। বাড়ির নোতুন নম্বর দাঁড়ালো '৩ নম্বর নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন'। বিরাট্ নাম—ভাগ্যিস্ তখনকার দিনে টেলিগ্রামের রেওয়াজ অতটা ছিল না। পরে শেষটায় আবার নাম আর নম্বর পাল্‌টে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৩ নম্বর সুকিয়াস্ রো! এই আড়াই কাঠার বাড়ি এখনও চাটুজ্যে পরিবারের হাতছাড়া হয় নি—এই বাড়ি আমার দাদা অনাদিকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র অনিলকৃষ্ণের অধিকারে আছে।† অনিলের দুই মেয়েদেরই বর্তাবে।

তখন এই অঞ্চলটা—আমার ছেলে বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯১০ পর্য্যন্ত, বেশ

* এই লেখাতে "একথা পরে" আর বলা হয় নি, তবে অন্যত্র ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে কিছু ব'লেছেন (দ্রষ্টব্য টীকা ৮)—অ।

† সুনীতিকুমারের অগ্রজ অনাদিকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।—অ।

পাড়াগাঁয়ের মতনই ছিল। এখানে ওখানে সেখানে ডোবা বা ছোটো পুখুর, মাঠ, না'রকল আর অন্য গাছ, গোলপাতায় ছাওয়া ঘর, ক্বচিৎ দু'চারখানা খাপরা বা টালির বাড়ি, আর এদিকে ওদিকে দুই একখানা ছোটো একতলা পাকা বাড়ি। রাস্তায় লোহার থামের উপরে কাচে ঢাকা চৌকো লণ্ঠন, তাতে সবে গ্যাসের পাইপ লাগিয়ে গ্যাস-ল্যাম্পের ব্যবস্থা হ'য়েছে আমাদের শিশু-কালে, কেরাসিন তেলের কাচের ল্যাম্পের বদলে। সন্ধ্যেবেলায় মিউনিসি-পালিটির ল্যাম্পওয়ালারা একটা ক'রে মই ঘাড়ে ক'রে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে সব লোহার থামের কাঁধের দুই লম্বা হাতের উপরে মই লাগিয়ে হাতের জলন্ত ল্যাম্প থেকে গ্যাসের কলের মুখ খুলে ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে যেত—সন্ধ্যেবেলায় এটা শহরের শোভার নিত্য পরিচর্য্যা ছিল। সেই সময়েই প্রায় সব গৃহস্থ গৃহে ও ঠাকুরঘরে আর তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালাতেন, জলছড়া দিতেন, আর শাঁখ বাজাতেন গৃহিণীরা আর বধূরা। গ্যাসের ল্যাম্প থেকে ধোঁয়া বেরুতো প্রচুর, আর পরে এই টিম্‌টিমে আলোকে ছাপিয়ে ক'লকাতার নৈশ অন্ধকার আরও গভীর দেখাতো। ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট গ্যাসের আলো দুই একটা বড়ো রাস্তায় ক্রমে-ক্রমে আসছে, আর বোধ হয় হাওড়া থেকে শেয়ালদহ পর্য্যন্ত তখনকার দিনের হ্যারিসন রোডে রাস্তার মাঝখানকার বড়ো বড়ো আলোক-স্তম্ভের উপরে আমাদের কাছে তখনকার দিনের আশ্চর্য্য বস্তু বিজলীর বাতির উজ্জ্বল আলো প্রথম দেখা দেয়।

ক'লকাতা তখনও—অর্থাৎ ৭০।৮০ বছর আগে, প্রায় খাঁটি বাঙালীর শহরই ছিল। কেবল বড়োবাজার অঞ্চলে, তুলাপটি খেঙ্‌রাপটি চিৎপুর রোডে মারোয়াড়ীদের বাস বেশি ক'রে ছিল, আর কলুটোলা ক্যানিং ষ্ট্রীট মুর্গিহাটা টেরিটিবাজারে পশ্চিমা আর বোম্বাইয়া মুসলমান দোকানী কাপড়ওয়ালা, ওষুধওয়ালাদের পাড়া আর বসতি ছিল। আর চিৎপুর রোডে ক্যানিং ষ্ট্রীট থেকে টানা প্রায় ধর্মতলা পর্য্যন্ত ছিল ক'লকাতার আর ক'লকাতার পূর্বের গাঁ ট্যাংরায় উপনিবিষ্ট চীনা চামড়াওয়ালা আর জুতোওয়ালা মুচিদের সারি-সারি দোকান—তাদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত চীনা নাম, A-Hoy, Choong Yee, A-That, Chao-Hing, Thoot-Sin, A-Sik-Im-Son, Fat-Lim, Hong-Yim, কাণ্টনী চীনা নাম, আর "খোদা-ঘর" বা মন্দির—এখনও তার কিছুটা অবশিষ্ট আছে। সাহেব-বাড়ির বা ইউরোপীয়ানদের দোকানের দামী বিলিতি জুতোর

চেয়ে এই সব চীনা-বাড়ির দোকানের [জুতোর] কদর বা চাহিদা কিছু কম ছিল না। এ ছাড়া, ধর্মতলা আর চাঁদনি অঞ্চলে ছিল মেটেবুরুজ অঞ্চলের বাঙালী মুসলমান দরজির কাটা কাপড় জামা পাৎলুনের সারি-সারি খোলার চালের একতলা দোকান, আর কোথাও বা (যেমন খিদিরপুরে কলিঙ্গ-বাজারে) বাঙলার বাইরের দক্ষিণী তেলুগু সেপাই আর খালাসীদের পুরাতন আড্ডা। গঙ্গার ঘাটগুলি ধীরে ধীরে উড়িয়া ব্রাহ্মণ ঘাটিয়ালদের দখলে আসছে। মোটের উপর শ্রমিক শ্রেণীর লোক অনেকটা বিহারী আর উড়িয়া হ'য়ে গেলেও, ক'লকাতা তখনও—৭০।৮০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত, প্রধানতঃ বাঙালীদেরই স্থান ছিল। এই কারণে বোধ হয় তখন এই শহর সম্বন্ধে আমাদের খাস ক'লকাতিয়াদের মনে ক'লকাতার সম্বন্ধে একটা আত্মীয়তাবোধ, একটা ভালোবাসা মমতা ছিল। এখন যেমন নানা জাতের মানুষের চাপে বাঙালী—এমন কি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থী বাঙালীও—কোণঠাসা হ'য়ে হতভম্ব হ'য়ে প'ড়ছে, সে রকমটা হয় নি।

বাবার ছেলেবেলা, যৌবন, প্রৌঢ়কাল, বার্ধক্যের বেশির ভাগ, এই ক'লকাতায় কেটেছিল। তাঁর বাবার তৈরি এই বাড়ি তাঁর বাস্তুভিটে ব'লে প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল, আর তিনি যা চেয়েছিলেন, এইখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস প'ড়েছিল [১৮ শ্রাবণ ১৩৫২/৩ আগস্ট ১৯৪৫]।

সে সময়ে ছেলেদের লেখাপড়া শুরু হ'ত সেকেলে পাঠশালাতে।—আগে মাটির উপর দাগা বুলিয়ে, তার পরে কলাপাতার উপরে আর পরে লম্বা 'পাততাড়ি'র সরু লম্বা এক একখানি তালপাতার উপরে মোটা খাঁকের কলমে ঘরের তৈরি কালিতে বাঙলা লেখা শিখ্‌ত ছেলেরা। একটু বড়ো হ'লে লেখাতে বেশি উন্নতি হ'লে, শস্তা হ'ল্‌দে রঙের 'বালির কাগজে' বাঙলা আর ইংরিজি লেখা আরম্ভ হ'ত, হাতের লেখা 'পাকা' করবার জন্য ঐ কম দামের কাগজের খাতার পাতাগুলিতে ক্রমাগত লাইনের পর লাইন ধ'রে লেখা 'মক্‌শ' ক'রে খাতা ভরাতে হ'ত, শেষটা খাতাখানার প্রত্যেকটি পাতা মক্‌শ-করা লেখার নকশার চাপে অপরূপ হ'য়ে উঠ্‌ত, যখন আর পাতায় একটুখানিও খালি জায়গা থাক্‌ত না, তখন সেই খাতা পুরাতন কাগজ-পত্র বই খবরের কাগজ

শিশি-বোতল কেনা মুসলমান ফেরিওয়ালাদের (আজকালকার ক'লকাত্তিয়া ভাষায় যাদের 'বিক্রিওয়ালা' বলা হয়) কাছে সের দরে ৪/৫ পয়সা থেকে দু'চার আনা পর্য্যন্ত সেরে বিক্রি হ'ত।

আমার জীবনে আমার হাতের লেখা শেখা সেকালের বাঙালী ঘরের ছেলের মতো সব পথ ধ'রেই চ'লেছিল। আমাদের পাড়ার সুকিয়াস্ স্ট্রীট (এখনকার কালের 'কৈলাস বসু স্ট্রীট') আর আমহার্স্ট স্ট্রীট (এখনকার কালের 'রাজা রামমোহন সরণি')-র মিলন-স্থানের দু'খানা বাড়ি পশ্চিমে যে শিবের মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে, প্রতিষ্ঠাতার নাম ধ'রে যে মন্দিরকে ছেলেবেলায় আমরা 'মহেশ ঘোষের শিবালয়' বা 'ময়শা গয়লার শিবমন্দির' ব'লে জানতুম (এখন এ নামটা আশা করি বদলানো হয় নি), তার সামনেই এক গোলপাতার ঘরে পাঠশালায় প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। বয়স তখন পাঁচ বছর আন্দাজ হবে। আমার দাদা ঐ পাঠশালায় যেত, ঠিক হ'ল আমি বাড়িতে মিছামিছি সময় নষ্ট না ক'রে দাদার সঙ্গে পাঠশালায় যাবো। খুব উৎসাহ আর আনন্দ হ'ল মনে—কিন্তু কে একজন বিজ্ঞ বৃদ্ধ আত্মীয় তখন হেসে আমায় ব'লেছিলেন, এখন পাঠশালায় যাবে ব'লে এত ফুর্তি লাগ্‌ছে, দু'দিন পরেই পাঠশালায় যাবার নামে কাঁদ্‌বে। মা আমার জন্য একখানা পাঁচহাতি বিলিতি কলের ধুতি কিনে আনালেন, তখনকার কালে বাঙালী ঘরের ছেলের হাফ-প্যাণ্ট পরার রীতি আসে নি—দিগম্বর অবস্থার পরেই একেবারে পাঁচহাতি ধুতিতে প্রোমোশন হ'ত। বইটই তখন কিছু হ'ল না। খালি একটা ছোটো মাদুরের আসন এল, পেতে বসবার জন্য। দাদার সঙ্গে পাঠশালায় প্রথম দিন গেলুম, সঙ্গে যথারীতি বাড়ির ঝী ছিল। পাঠশালা ব'লতে খালি গুরুমশাইয়ের থাক্‌বার দু'খানা গোলপাতা-ছাওয়া ঘর, সামনে এক চিল্‌তে সরু গোলপাতা-ঢাকা দাওয়া বা বারান্দা, তারই এক দিকে তাঁর রান্নাঘর, বারান্দার খুঁটিতে দু'টো হুঁকো ঝুলছে, একটির গায়ে একটা কড়ি বাঁধা, সেই হুঁকো থেকে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তামাক খাবেন। খালি গায়ে, তিনি দাওয়ায় একটি মাদুরের উপরে ব'সে আছেন। হাতে একগাছি সরু বেত। ঝী গিয়ে ব'ললে—গুরুমশাই, এই ছেলেটিকেও ভরতি ক'রে নিন, এর দাদার সঙ্গে আজ থেকে রোজ সকালে আসবে,

মাইনে সিধে দেওয়া হবে। এই হ'ল সহজভাবে বিদ্যাস্থানে আমার প্রবেশ। বাইরে উঠানে রোদ্দুরের মধ্যে গুটি তিরিশ ছেলে নানা রকম কলরব ক'রতে ক'রতে প'ড়ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়', "প্রথম ভাগ", "দ্বিতীয় ভাগ" আর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', আর বড়ো ছেলেদের জন্য বটতলার ছাপা 'শিশুবোধক'। প্রত্যেক ছেলের আলাদা মাদুরের আসন, কারো তালপাতার পাততাড়ি, কারো বা বালির কাগজের খাতা। স্লেট্ ('সেলেট') নাই ব'ললেও হয়। গুরুমশাই ব্রাহ্মণ, আধাবয়সী, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথায় টিকি। আমায় দেখে একবার বেশ ভালো ক'রে তাকালেন, তাতে আমার বড্ড ভয় হ'ল। ব'ললেন, "বেশ, এইবার থেকে রোজ দাদার সঙ্গে পাঠশালায় আস্‌বি, দাদার পাশে ব'স্‌বি, আর মন দিয়ে প'ড়বি, লিখ্‌বি। আর যদি পড়াতে অমনোযোগী হ'স, তা হ'লে, এই যে বেত দেখ্‌ছিস, এই বেত দিয়ে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় ক'র্‌বো।"—এই হ'ল শিক্ষায় আবাহন—সে যুগের 'কুমার-কানন' বা Kindergarten. একটু ভয় হ'ল—রোজ রোজ গুরুমশাই বেত মারবে না কি ?

যা হোক্, প্রথমটায় মাটিতে "দাগা বুলিয়ে" অর্থাৎ রামখড়ি দিয়ে গুরুমশাই "অ, আ, ক, খ" সব লিখে দিতেন, সেগুলি খড়ি দিয়ে বুলিয়ে, পরে তালপাতায় খাঁকের কলমে লিখে, মা সরস্বতীর সাধনা শুরু হ'ল। কলাপাতার উপরে লেখাটা পাঠশালায় করানো হয় নি, বাড়িতে মায়ের তত্ত্বাবধানে সপ্তাহ খানেক ধ'রে কলাপাতার পাঠ হয়। এইভাবে দাদার সঙ্গে এই পাঠশালাতেই হাতে-খড়ি—গুরুমশাই এক দিনও বেত মারেন নি। সকাল ৭॥-৮টায় পাঠশালা ব'স্‌ত, ঝীয়ের সঙ্গে আস্‌তুম, আবার বেলা ১১-১১॥টায় পাঠশালা শেষ হ'ত। শেষ হ'ত 'শট্‌কে বা শতকিয়া', 'কড়াকে বা কড়াকিয়া', 'বুড়্‌কে বা বুড়িকিয়া' আর 'নামতা' বা গুণন-সংখ্যা, এক থেকে ১০০ পর্য্যন্ত সব ছেলে মিলে সুর ক'রে তারস্বরে পাঠ ক'রে—'নামতা' হ'ত বারো দশক পর্য্যন্ত মুখস্থ পাঠ ক'রে।

এইভাবে পাঠশালায় লেখাপড়ার সূত্রপাত। পরে ঐ পাড়াতেই, তখনকার দিনের ৬৩নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে, Calcutta Academy ব'লে একটি এণ্ট্রান্স ইস্কুলে দু বছরের জন্য ভরতি হ'লুম। ইংরিজি মতে Infant Class-এ, বাঙলা 'প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ' আর 'শিশুশিক্ষা' আবার ভালো

ক'রে ধরানো হ'ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্যারীচরণ সরকারের ইংরিজি First Book of Reading—বোধ হয় অর্ধ শতক ধ'রে এই বই বাঙালী ছেলেদের ইংরিজি পাঠ আরম্ভ ক'রতে সাহায্য ক'রে এসেছিল। যেমন ১০০ বছরের বেশি ধ'রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙলা 'প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ' আর "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা" আর সংস্কৃত "ঋজুপাঠ" তিন ভাগ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের প্রধানতম সাধন হ'য়েছিল।

Calcutta Academy-তে যখন ভরতি হই, আমার ৭।৮ বছর বয়সে, তখন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য আর পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য ব'লে দুই ভাই ঐ ইস্কুলটি চালাতেন। দু'জনেই বেশ রাশভারী মাষ্টার ছিলেন। ইস্কুলটি পরে ৬৩ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে উঠে গিয়ে ওঁদেরই একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়—ঐ আমহার্স্ট স্ট্রীটেই একটি বাড়িতে যুগলকিশোর দাসের গলির সামনে। উত্তরকালে যখন কলেজে অধ্যাপনা ক'রতে থাকি, একটু নাম-ডাকও হয়, তখন এঁরা এঁদের ইস্কুলের Infant Class-এর এক নগণ্য ছাত্রকে স্মরণ ক'রে ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় আহ্বান ক'রে যথেষ্ট হৃদ্যতার পরিচয় দেন। বোধ হয় ইস্কুলটি এখনও টি'কে আছে।

এর পরে [১৮৯৮ সালে] ক'লকাতায় প্লেগের মড়ক দেখা দিলে, প্রাণের ভয়ে আমরা আমার পিতামহের তৈরি ৬৪ নং সুকিয়াস্ স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে শিবপুরে আমার দিদিমা আর মামাদের আশ্রয়ে গিয়ে এক বছর কাটাই—ঐ বছরটা আমাদের পক্ষে পরম আনন্দে কাটে, কারণ শিবপুরে কোনও ইস্কুলে এক বছরের জন্য ভরতি হওয়া হয়ে ওঠে নি। তবে মামারা সংগতিপন্ন ঘরের ছিলেন, তাঁদেরই একখানি বাড়িতে আমরা ছিলুম, প্রায় সমান বয়সের মাসতুতো ভাই কতকগুলিকে পাই, পল্লীজীবনের একটা স্বাদ বেশ ভালোভাবেই পেয়েছিলুম—ক'লকাতার ছেলে ব'লে যেটার অভাব ছিল। এখনকার মতন তখন হাওড়া শহর এক অতি জনাকীর্ণ উপনগরে চেহারা বদলায় নি—শিবপুর ঠিক পল্লীগ্রামই ছিল।

একটি পুরো বছর পরম আনন্দে শিবপুর গ্রাম যেন "চ'ষে" বেড়াতুম। প্রচুর খালি জায়গা—মাঠ, বাগান, গাছ-পালা, ছোটো বড়ো পুখুর, রাস্তায়

কেরোসিন-তেলের ল্যাম্প অতি বিরল ল্যাম্প-পোষ্টের উপরে জ্ব'লত। দু পাঁচ-খানা থার্ড ক্লাস ভাড়াটে, হাড্ডিসার দুই টাট্টুতে টানত। আমার মাতামহ টারনার মরিসন কোম্পানির আপিসের মুচ্ছুদ্দি বা বড়োবাবু ছিলেন, 'দেশে' অর্থাৎ সিংটি-শিবপুর গ্রামে তাঁর জমিজমা ছিল—তাঁর নিজের গাড়ি আর দু-তিনটে ভালো ঘোড়া ছিল—বেশ মনে আছে, একটা ঘোড়া ছিল হ'লদে রঙের আর একটা সাদা—তাঁকে জীবনে আমার ৬/৭ বছর বয়সে বোধ হয় দুই একবার দেখেছি। ধবধবে সাদা চাপকান ধুতি, মাথায় সাদা কাপড়ের মুরেঠা পাগড়ি, এই প'রে তিনি আপিস যাবার জন্ম গাড়িতে উঠছেন। তাঁর পাঁচ মেয়ে—বড়ো বিজয়া, মেজো আমার মা কাত্যায়নী, সেজো অন্নপূর্ণা, ন' ত্রিগুণা, আর ছোটো মনোরমা। দুই ছেলে ছিল, আমার দুই মামা, বড়ো মন্মথনাথ, ছোটো প্রবোধনাথ (দাদামশায়ের মৃত্যুর পরে ছোটো মামার জন্ম হয়)। চার মেশোমশায়, সকলকেই দেখেছি, সকলেই অতি অমায়িক সজ্জন ছিলেন, আমাদের বেশ স্নেহ ক'রতেন—বড়ো মেসোমশাই বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি আদালতে চাকরি ক'রতেন, তিনি থাকতেন নোয়াখালিতে। সেজো মেসোমশাই নিরাপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন টারনার মরিসন কোম্পানির শালিমার রঙের কারখানার বড়োবাবু। ন' মেসোমশাই ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিল্লীতে ভারত সরকারের কী দপ্তরে কাজ ক'রতেন—প্রতি বৎসর তাঁকে দিল্লী-শিমলা যাওয়া-আসা ক'রতে হ'ত—ধীরভাবে, খুব অভিজাত ধরনে কথাবার্তা ক'রতেন। আর ছোটো মেসোমশাই শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলা আদালতের এক নামী উকিল ছিলেন—খুব উচ্চশিক্ষিত, সকলেই তাঁর কাছে যুক্তি পরামর্শ নিত। মামার বাড়িতে একটা কিছু হ'লেই পাঁচ বোনের মিলন হ'ত—আর সঙ্গে-সঙ্গে মহা আনন্দে আমরা প্রায় দু ডজন মাসতুতো ভাই-বোন একত্র হ'তুম—সেটা ছিল ছেলেবেলার অতি কাম্য আনন্দ, বিশেষতঃ কোনও উৎসবের দিনে। মামার বাড়িতে দিদিমার যত্নে তাঁর দৌহিত্রদের মধ্যে "দীয়তাং ভুজ্যতাং" সারাক্ষণ চ'লত—আর আমার ঘোড়া-ঘোড়া বাই ছিল, বড়ো মামার আস্তাবলে তিন চারটে ঘোড়া, সেখানে গিয়ে সহিসদের সঙ্গে ভাব জমাতুম, ঘোড়াগুলিকে দানা খাওয়াতে দেখতুম, সহিসদের আর কোচমানের উপর উৎপাত ক'রতুম।

এই মামার বাড়ির গুটিকয়েক স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জল্ জল্ ক'রছে।

প্রথম তো দিদিমার কথা। অতি বুদ্ধিমতী "দশকর্মান্বিতা" মেয়ে ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর জমিদারি আর অত বড়ো সংসার পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, এমন কি দাপটের সঙ্গে তিনি চালাতেন। সব বিষয়ে তাঁর কথাই ছিল যেন শেষ কথা— অথচ জোর ক'রতেন না। তার পর, বাড়িতে দুচারজন পুরোনো চাকর ছিল, তাদেরও রোয়াব কম ছিল না। তারা ছিল দিদিমাদের গ্রামের জমির প্রজা। শিবপুরে এসে ঘরদোর সব তারা নিজের মতন ক'রে দেখ্‌ত। বাড়িতে ৬/৭টা গোরু ছিল—সব ঝী চাকররাই দেখ্‌ত, কিন্তু তদারক ক'রত বুড়ো চাকর কার্ত্তিকচন্দ্র বা "কার্ত্তিকে"। আমাদের, বাড়ির ভাগ্নেদের, কি শাসনটাই সে না ক'রত—ছেঁড়া কাগজ, না'রকল মালা, না'রকল পাত, এসব দিয়ে বৈঠকখানা অপরিষ্কার ক'রছি দেখলেই সে হুংকার ছাড়্‌ত, আমাদের আত্মাপুরুষ যেন খাঁচা-ছাড়া হ'য়ে যেত—মামারা বয়সে ছেলেমানুষ ছিলেন, তাঁদেরও বাদ দিত না। বাড়িতে হিসেব টিসেব লেখবার জন্য, ফাই-ফরমাস খাটবার জন্য, দরকার হ'লে ছেলেমেয়েদের ক-খ-গ শেখাবার জন্য, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁর নামটা ভুলে গিয়েছি, তাঁর কথাও মনে পড়ে। তবে তিনি হিসেবপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর ছিলেন "মানি-কাকা"। ইনি একটি অসাধারণ চরিত্রের খাঁটি মানুষ—সরল, পরোপকারী, ধার্মিক প্রকৃতির। এঁর কথা মনে হ'লেই এঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। এঁর সম্বন্ধে আমি বহু পূর্বে একটি নিবন্ধ লিখেছি, সেটা প'ড়ে অনেকেরই মনে এঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জেগেছে।* দিদিমা তান্ত্রিক মতের ছিলেন, দেবীর উপাসনা ক'রতেন, দুর্গা কালী দশমহাবিদ্যা এঁদের সম্বন্ধে ভক্তি-সংগীত লিখ্‌তেন (তাঁর লেখা ছোটো একখানি দেবীপূজার গানের সংগ্রহ তিনি ছাপিয়ে বিতরণ ক'রেছিলেন)। তাঁর একজন দীক্ষাগুরু ছিলেন, কৌলিক মন্ত্রদাতা, তিনি বছরে দু-তিন বার ক'রে মামার বাড়ি শিষ্য-গৃহে পদার্পণ করতেন—সে সময়ে আমরা থাকলে খুবই তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিতুম। দিদিমা নানা উপচারে গুরুদেবের আহারাদির সুন্দর এবং প্রচুর আয়োজন ক'রতেন, আর তা থেকে আমরাও বঞ্চিত হ'তুম না—ভালো গাওয়া ঘীয়ের লুচি, রকমারি শাক-সব্‌জি, ভালো মাছ কাত্‌লার মুড়ো, গল্‌দা চিংড়ি, দই, পায়স, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, মিষ্টান্ন। দিদিমা সংকল্প ক'রে উপর-উপর চার বৎসর বাড়িতে কালীপুজো করেন। তখন আমার বয়স ১১।১২ হবে।

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "মানি-কাকা"। —অ।

মাসতুতো ভায়েরাও ছিল, তারা তো হরদম পটকা একদমা দোদমা বোমা ফাটিয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে তুল্‌ত, অন্য বাজিও পোড়াত। এই পুজোতে একটা জিনিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। সেটা হ'চ্ছে প্রায় সারা রাত্রি ধ'রে কালীপুজোর অনুষ্ঠানটি পুরো দেখা। শুন্‌লুম, কালীপুজো, মায় পাঁঠাবলি হবে রাত্রে, রাত নটার পর থেকে সারারাত ধ'রে পুজো হবে, ভোরের দিকে বলিদান। এখনকার মতন উপযুক্ত বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিত পুরোহিত তখন দুর্লভ হয় নি। ভালো পুরোহিত পাওয়া গিয়েছিল, দুজন তন্ত্রধারক তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। আমরা মাত্র ৩।৪ জন দ্রষ্টা এবং শ্রোতা—তখন এই-সব পুজো পাঠের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস ছিল। যখন তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি নানা বীজমন্ত্র "ঐং হ্রীং ক্লীং হসৌ ওঁ ফট্‌" প্রভৃতির সঙ্গে নিশুতি রাত্রে পাঠ হ'তে লাগ্‌ল, একটা রোমাঞ্চকর eerie feeling আমাকে কতকটা অভিভূত করে। মনে হ'ল, বামুনের ঘরের ছেলে, এই পুজো দেখ্‌বার সুযোগ আমার পক্ষে যেন মা-কালীর দান। পরে আমাকে তন্ত্রশাস্ত্র—মহানির্বাণ তন্ত্র, ষট্‌চক্রভেদ, প্রভৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে হয়, ইংরিজিতে এম-এ পাস করবার পরে—পিতৃবন্ধু প্রতিবেশী অটলবিহারী ঘোষ মহাশয় আর তন্ত্রানুসন্ধানী হাইকোর্টের জজ উড্‌রফ সাহেবের টানে*—তখন এই কালীপুজোর সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতাটুকু কার্য্যকর হ'য়েছিল।

মামার বাড়ি থেকে আর একটি বিষয়ে আমার মানসিক সংস্কৃতির একটু উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পেয়েছিলুম—সেটা হ'চ্ছে আমাদের কালোয়াতি সংগীত ধ্রুপদ খেয়ালের সৌন্দর্য্যের দিকে একটা আকর্ষণ। আর তা থেকে উত্তরকালে স্বদেশের ও বিদেশের Classical Music উচ্চকোটির মার্গসংগীতের উদাত্ত মধুর-গম্ভীর বায়ুমণ্ডলের অনুভূতি আর সে সম্বন্ধে অব্যক্ত প্রীতি। মামাদের তখন যৌবনকাল, আমরাও ইস্কুলের ছাত্র সে সময়ে।

দিদিমার অতন্দ্র দৃষ্টি, মামারা দুজনেই খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন, বদ-সংসর্গে

* স্যর জন জর্জ উড্‌রফ তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা করেন, 'আর্থার আভালন' ছদ্মনামে কতকগুলি গ্রন্থ সম্পাদন আর রচনা করেন। উড্‌রফ সাহেবের অনুরোধে সুনীতিকুমার তাঁর জন্যে তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু কিছু মূল সংস্কৃত থেকে ইংরিজিতে অনুবাদ ক'রে দেন। —অ।

মিশে বদ-খেয়ালির চক্করে পড়েন নি। তখন শিবপুরে একটু অবস্থাপন্ন ঘরের তরুণদের মধ্যে গানবাজনার শখ আর চর্চা ছিল। মামাদেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল ওস্তাদি বা কালোয়াতি গান শিখবেন। কোনও বড় ওস্তাদের শাগরেদ হ'য়ে যে নিয়মিত ধ্রুপদ খেয়ালের সাধনা আরম্ভ ক'রেছিলেন তা নয়, বাড়িতে প্রায়ই ওস্তাদি গানের মাইফেল বা মহফিল অর্থাৎ আসর ডাকতেন। শিবপুর হাওড়া কলকাতা আর আরও দূর জায়গা থেকে নামী গাইয়েদের পাখওয়াজীদের তবলচীদের আহ্বান ক'রে আনতেন, শনিবার দিন প্রায় সারা বিকাল আর রাত্রির প্রথম প্রহর ধ'রে গানের মজলিস চ'লত। চায়ের প্রচলন তখন হয় নি, হরদম পান তামাক চ'লত। আট দশখানা ঘোড়ার গাড়ি মামার বাড়ির পাশে জমা হ'ত, সহিস কোচুয়ানরা ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা ক'রত, পয়সাওয়ালা গানের শৌখীন মামার বন্ধুরা আসতেন। তখন শিবপুরে (কি হাওড়ায় ঠিক এখন স্মরণ নেই) নিকুঞ্জ দত্ত বা কানা নিকুন নামে এক বিখ্যাত ধ্রুপদী ছিলেন, তাঁকে প্রায়ই আনা হ'ত। পাখোয়াজ আর তানপুরার সংগতে ধ্রুপদ ছিল প্রধান চর্চার বিষয়, বাঁয়াতবলা আর তানপুরা, আর কালেভদ্রে বা সেতার নিয়ে খেয়াল, এও চ'লত। এর নীচে এঁরা নামতেন না। হয়তো বা মেয়েদের অনুরোধে দয়া ক'রে কেউ বা একটা 'শ্যামাসংগীত', অথবা 'নিধুবাবুর টপ্‌পা' গাইলেন—এই যা, ব্যস্‌। বাড়ির ভাগ্যে আমরা অনেক সময়ে বড়োদের এই গানের মজলিসের এক কোণে জায়গা ক'রে নিতুম। আমি বুঝ্‌তুম না কিছু, কিন্তু ধ্রুপদের বিরাটত্ব কেন জানি না আমাকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌ত। অন্য সব ধরনের গানের প্রকার চাল বা সুর—এমন কি বাঙলার চল্‌তি ঢপ কীর্তনও—কেমন যেন খেলো, যেন নিম্নশ্রেণীর মনে হ'ত। এই ভাবটা বরাবরই র'য়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংগীতের প্রতি আমার এই যে টান মামার বাড়ির পরিবেশের কল্যাণে কী ক'রে মনে গেঁথে গেল, সে সম্বন্ধে পরে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি—সেটা ছাপা হ'য়েছে, দু-চারজনের ভালোও লেগেছে।[৯]

মামার বাড়ির সঙ্গে যোগের ফলে ছেলেবেলায় সমানবয়সী মাসতুতো ভাইয়েদের সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। মামার বাড়িতে মা আর মাসিরা যেন এক পরিবারের লোক হ'য়ে পড়েন, এঁদের ছেলেপুলেরা একই পরিবারের মতো, সব ক'টি মাসতুতো ভাই-বোন যেন ছিল এক মায়ের পেটের

ভাই-বোন—সকলকে একসঙ্গে ধ'রে নাম করা হ'ত। বড়ো মাসিমার ছেলেরা নিত্যরঞ্জন, সত্যরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন, [জ্ঞানরঞ্জন], ঝী-চাকরদের কাছে আর অন্য মাস্‌তুতো ভাই-বোনদের কাছে ছিল বড়্‌দা, মেজ্‌দা, সেজ্‌দা, ন'দা; আবার আমার দাদা অনাদি আর আমিও ছিলুম বাড়ির অন্যতর বড়্‌দা, মেজ্‌দা। সকালে এই একপাল ছেলেমেয়ে একসঙ্গে ব'সে জল খেতুম—রুটি বা পরটা, আলুভাজা, বেগুনভাজা, শাকভাজা, গুড়, একবাটি ক'রে দুধ। দুপুরে আমরা একসঙ্গে গোল হ'য়ে ব'স্‌তুম। মস্ত এক থালায় দা'ল, ভাত, ঝোল, চচ্চরি, টক, দুধ নিয়ে মাঝখানে ব'স্‌তেন দিদিমা, বা কোনও ঠানদিদি, বা মায়েরা কয় বোনের কেউ—তিনিই ভাত তরকারি মেখে প্রত্যেকের মুখে পর পর এক এক গ্রাস ('গরাস') ক'রে খাওয়াতেন। তখন সে বার প্রথম সিমেণ্টের মেঝে হ'ল মামার বাড়ির এক দালানে—কী চমৎকার লাগ্‌ত, মার্বল পাথর তখন কোথায়? খুব ভালো ক'রে ধুয়ে মুছে দেওয়া হ'ত সে মেঝে, তারপরে সেই পরিষ্কার মেঝেতে ঢালা হ'ত এক ধামা গরম গরম মুড়ি, আর গোটা দশটা কি পনেরোটা কলা, আর খানিকটা গুড়, আর দু'চার হাতা দুধ, একজন কেউ এসে সেই সবটা চ'ট্‌কে একসঙ্গে মেখে দিতেন, আর তার চারদিকে ব'সে ছেলেমেয়ের দল তাতেই বিকালের জলখাবার সারতুম—এর উপর এক বাটি ক'রে দুধ ছিল। দুপুরে মায়েরা পাড়ার মেয়েরা গিন্নিবান্নিরা তাস খেলছেন, গল্প ক'রছেন—আর আমরা এদিকে দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছি। বড়ো বাড়ি, মায়েদের প্রত্যেকের জন্য ঘর ছিল, বাবা আর মেসোমশায়রা এলে সেই বাড়ির মধ্যেই যেন কতকগুলি পরিবারের বাস হ'ত। মামাদের বিয়ে হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে দুই ভাইয়ের দু'খানা বড়ো বড়ো ঘর তৈরি হ'ল—আর কতকগুলি দামী আসবাবপত্র আরশি, বড়ো বড়ো ছবি, এসব এসে বাড়ির সৌষ্ঠব বাড়ালে।

এই মামার বাড়িতেই দিদিমার আর মামাদের আগ্রহে আমার বড়ো মাসির ন' ছেলে জ্ঞানরঞ্জন আর আমার দুজনের পইতে একসঙ্গে দেওয়া হয়। জ্ঞান আর আমি এক বয়সের, বোধ হয় ২/৫ মাস বড়ো আমার চেয়ে। একটা পুরোনো কথা আছে—মাস্‌তুতো ভাইয়েদের মধ্যে হয় সহজ মৈত্রী, আর জেঠুতো খুড়ুতো ভাইদের মধ্যে সহজ বৈরি-ভাব—এদের মধ্যে বংশগত সম্পত্তির ভাগ-বখরার কথা আছে কিনা। জ্ঞান শিবপুরে থেকে হাওড়া জেলা ইস্কুল থেকে, আর আমি ক'লকাতায় মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুল থেকে, একসঙ্গে

এণ্ট্রান্স পাস করি ১৯০৭ সালে। জ্ঞান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই-এস-সী পাস ক'রে মেডিকেল কলেজে ঢোকে, ডাক্তার হ'য়ে বা'র হয়, "স্বদেশী আন্দোলনের ছেলে" ব'লে, পরে অনেক পোড় খেয়ে শেষটায় ব্রিটিশ আমলেই সরকারি ডাক্তার ডিস্ট্রিকট সিভিল সার্জন হয়। আর আমি জেনেরাল অ্যাসেম্ব্রিজ ইন্‌স্টিট্যুশন থেকে ইণ্টারমিডিয়েট ইন্ আর্টস, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ আর এম্-এ পাস ক'রে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হই। একসঙ্গে আমাদের পইতে, নেড়া হওয়া কান-ফোঁড়া, রোদ্দুর দেখা থেকে আর শুদ্দুরের মুখ দেখা থেকে নিজেদের বাঁচানো, দণ্ডিঘরে থাকা, হবিষ্যি করা, গঙ্গায় গিয়ে দণ্ড ভাসানো—বড়োই কৌতুককর লেগেছিল।* খুব খেটে ঐ সময়ের মধ্যে দু'জনেই শ্যামাচরণ কবিরত্নের "আহ্নিককৃত্যম্" থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিকের মন্ত্রগুলি মুখস্থ করি—মানে না বুঝে। তবে গায়ত্রীটার মানে মোটামুটি আয়ত্ত ক'রতে পেরেছিলুম, আর গায়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল। মামার বাড়িতে তখন একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী ছিলেন, খাতাপত্র লিখতেন, তিনি আমাদের সন্ধ্যা করাতেন। মামার বাড়ির সামনে এক বাড়িতে আমাদের বয়সের একটি ছেলে ছিল, তার নাম ছিল জগৎপতি, তার সঙ্গে খুব ভাব হ'য়েছিল, তারও পইতে আমাদের বছরেই হয়; সে খুব নিষ্ঠাবান্ হ'য়ে ওঠে, সন্ধ্যার মন্ত্র আর গায়ত্রী খুব যত্ন ক'রে প'ড়ত—পরে শুনলুম হঠাৎ সে কয়দিনের মাত্র অসুখে মারা যায়, মৃত্যুর পূর্বে কয়দিন ধ'রে আর শেষ নিশ্বাস নেবার সময়েও সে আঙুলে পইতে জড়িয়ে গায়ত্রী জপ ক'রত। তার এই ভক্তি আমাকে খুবই অভিভূত ক'রেছিল।

আমার ইস্কুল পর্বটার সম্বন্ধে কিছু "স্মৃতিচারণ" ক'রবো এবার।

ক'লকাতায় প্লেগের মড়কের ভয়ে আমরা তো এক বছর শিবপুরে মামাদের আশ্রয়ে কাটালুম—মামাদের একখানা বাড়িতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। বাবা ক'লকাতায়, লালদীঘীর ধারে Writers' Buildings রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে Lyons Range লায়ন্‌স্ রেঞ্জ সড়কে অবস্থিত ইংরেজ

* সুনীতিকুমারের এই মামুতো ভাই জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বছর আগে দেহরক্ষা ক'রেছেন।—অ।

ব্যবসায়ীদের দপ্তরে Turner Morrison and Co টার্নার মরিসন অ্যাণ্ড কোম্পানির আপিসে চাকরি ক'রতেন। তিনি শিবপুর আমাদের বাড়ি থেকে* হেঁটে গঙ্গার ঘাটে আস্তেন, সেখান থেকে পান্সি নৌকোয় চ'ড়ে নদী পেরিয়ে হাইকোর্ট-এর সামনে চাঁদপাল ঘাটে নাম্তেন, তারপরে বাকি পথটুকু আপিস পর্য্যন্ত হেঁটে যেতেন। তখন গঙ্গা-পারানির এই-সব পান্সি নৌকো শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে, শিবপুর ঘাট থেকে, রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে, সাল্কে বালি থেকে এপারে খুব আস্ত, নৌকোর উপরে ভাসমান হাওড়ার সাঁকোতে সকলের কুলাত না। এই-সব পারানি নৌকো এখন উঠে গিয়েছে—মাঝে খেয়া-স্টীমার তার স্থান নিয়েছিল, এখন তা-ও নেই—ট্রাম বাস হওয়ায় ডাঙা পথেই লোক চলাফেরা করে এখন, জলপথে পারাপার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এই-সব খেয়া বা পারানি নৌকো চালিয়ে হুগলী মেদিনীপুরের বিস্তর বাঙালী মাঝি দু মুঠো ক'রে খেত। আপিসের বাবুরা, অন্য যাত্রীরা সকাল বিকাল এই-সব নৌকায় 'শেয়ারে' যাওয়া-আসা ক'রত—১৬।১৭ জন যাত্রী সাধারণতঃ একটা নৌকায় উঠ্ত, একজন ক'রে মাঝি, দুজন ক'রে দাঁড়ি, একটা পালও ছিল, হাওয়া অনুকূল হ'লে সেটা মাস্তল লাগিয়ে তাতে চড়ানো হ'ত। শিবপুর থেকে চাঁদপাল ঘাট—ভাড়া জনা-পিছু ছিল দু পয়সা ক'রে। আপিসের বাবু যাত্রীদের জন্য তামাকের ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণদের জন্য কড়ি-বাঁধা হুঁকো, একজন দাঁড়ি নৌকো ছাড়বার আগে তামাক সেজে হুঁকোয় ক'লকে বসিয়ে যাত্রীদের সেবায় দিত। এইভাবে আমরাও কতবার শিবপুর থেকে ক'লকাতায় যাওয়া-আসা করেছি। যে বছরটা আমরা প্লেগের ভয়ে শিবপুরে ছিলুম, সুখের বিষয় সেই পুরো বছরটা আমাদের কলকাতার বাড়ি খালি প'ড়ে থাকে নি—আড়াই কাঠা জমির উপর চারটে ঘর একটা দালানওয়ালা কোঠা বাড়ি—দালানটা আর একটা ঘর ছিল খোলার চালের—মাসিক পনেরো টাকায় এক ভাড়াটে পাওয়া গিয়েছিল—রাজকুমার বাঁড়ুজ্জে ব'লে আপিসের কেরানি এক ভদ্রলোক, অতি সজ্জন—আমরা ফিরে আসবার সময়েই তিনি বাড়ি ছেড়ে দিলেন, অন্যত্র উঠে গেলেন। তখন লোকসংখ্যা এত হয় নি, বাড়ির অভাব ছিল না।

ক'লকাতায় ফিরে এসেই, কোনও ইস্কুলে আমাদের ভর্তি ক'রে দেবার

* "শিবপুর আমাদের বাড়ি থেকে", অর্থাৎ শিবপুরে মামাদের যে বাড়িতে ওঁরা থাকতেন।—অ।

কথা হ'ল। বাবার মাসিক বেতন তখন বোধ হয় ৩৫ কি ৪০ টাকা মাত্র, আজকালকার হিসাবে তার মূল্য হবে ১২৫।১৫০ টাকা। নিজেদের বাড়ি, বাড়িভাড়ার পাট নেই, তবু ঐ টাকার মধ্যে চারটি প্রাণী, ছোটো ছেলেমেয়ে চার পাঁচটি, ঝী একজন, লোকলৌকিকতা, জলের ভারীর মজুরি, হাড়ী বা মেথরের মাইনে, এই-সব খরচ ছিল, আর সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে লালদীঘী পর্য্যন্ত ট্রামের বা শেয়ারের গাড়ির খরচ পাঁচ পয়সা ক'রে, এর উপর ইস্কুলে যাবা'র বয়সের আমরা দুই ভাই, দাদা আর আমি, তাদের মাসিক বেতন, সেও দেড় টাকা দেড় টাকা ক'রে তিন টাকা। চা'লের দাম তখন ছিল দু টাকা ন'সিকে ক'রে মন, সেই দাম কিছুদিন পরে যখন আড়াই টাকায় উঠ্‌ল—তারপর থেকে দাম তো কখনও কমল না, বেড়েই চল্‌ল—তখন ঠাকুমা মাথায় হাত দিয়ে ব'ললেন—বাবার মাইনে তখন কিছু বেড়েছে—টাকা পঁয়তাল্লিশ হবে—এই মাইনে দিয়ে ক'লকাতায় এত বড়ো সংসার কী ক'রে চ'লবে। তখন ঠিক হ'ল যে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত হ'লেও, আমাদের দুই ভাইকে হ্যালিডে স্ট্রীটের মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুলেই ভর্ত্তি করাবার চেষ্টা করা হবে—এক পয়সাও মাইনে লাগবে না, তবে নয় দশ বছর বয়সের ছেলেদের একটু লম্বা পথে রোজ যাওয়া-আসা ক'রতে হবে। পুণ্যশ্লোক মোতীলাল শীল মহাশয় (এখন থেকে দেড়শ' বছর আগেকার ঢঙের ইংরিজি বানানে Motılal Sıl -এর বদলে Mutty Lall Seal) গরিব অবস্থা থেকে নিজের সততায় আর বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীদের মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন— যেমন তাঁর উপার্জ্জন ছিল, তেমনি তাঁর দুঃখীর প্রতি দরদ আর জনসেবা – গরিবকে অন্নদান, রোগীর সেবা, আর শিক্ষার বিস্তার—প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার, আর ইংরিজি ইস্কুলের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা দুইয়েরই। ১৮৪২ সালে তিনি একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরিজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—বিদ্যার্থী যে-কেউ আসবে তাকে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে বিনা বেতনে তার ছাত্রজীবনে ভালো ক'রে পড়াবার ভার নেওয়া হবে। এই ইস্কুলটি প্রথমটায় মিশনারি সাহেবদের হাতে দেওয়া হয়, পরে মোতীলাল এটিকে স্বতন্ত্র একটি বাঙালীর পরিচালিত বিদ্যালয় রূপে দাঁড় করান, ১৮৪৩ সালে—৩০০।৪০০।৫০০, পরে আরও বেশি ছাত্র এই ইস্কুলে বিনা বেতনে প'ড়ত। ইস্কুলটিকে চিরস্থায়ী charity বা ধর্মদেয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু সেই সময়ে নাকি একশ' বছরের বেশি কোনও

Charitable Institution বা বিনা শুল্কের প্রতিষ্ঠান করার আইন-গত বাধা ছিল, সেইজন্ম বাধ্য হ'য়ে মোতীলাল ইস্কুলটিকে ১০০ বছরের জন্মই কায়েম করেন। ইতিমধ্যে ইস্কুলটির উন্নতি হ'তে থাকে, আর যখন ১৮৫৭ সালে ক'লকাতা বিশ্ববিত্যালয় ইংরেজ গভর্নমেণ্ট স্থাপিত ক'রলে, তার পরে ক'লকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সঙ্গে মোতী শীলের ইস্কুল (সরকারি নাম Seal's Free College), সংযুক্ত হ'ল। ১৮৪৩ সাল থেকে একশ' বছর পরে ১৯৪৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির আইন অনুসারে বন্ধ হ'য়ে যাবার কথা। মোতী শীল মহাশয়ের বংশের উত্তরাধিকারীরা তখন ইচ্ছা ক'রলে এই ইস্কুলের জন্ম তাঁর প্রদত্ত টাকা তুলে নিয়ে, নিজেদের যাঁর যেমন প্রাপ্য তেমনি অংশ ভাগাভাগি ক'রে নিতে পারতেন। কিন্তু অসাধারণ মহানুভবতা দেখিয়ে তাঁর বংশধরেরা (দুই একজন ছাড়া) এই টাকা নিলেন না, উপরন্তু ইস্কুলটিকে তাঁদের পূর্বপুরুষের এবং বাঙালী হিন্দু জাতির অবিনশ্বর কীর্তি ব'লে চিরস্থায়ী ক'রে নূতন ভাবে পত্তন ক'রলেন।

১৮৯৯ সালে যখন আমরা দুই ভাই ভর্তি হ'লুম*, তখন এ-সব ছিল দূরের কথা। ভর্তির সময়ে একটু চেষ্টা ক'রতে হ'য়েছিল। ঠাকুদ্দা একটু ঘোরাঘুরি ক'রেছিলেন, আর ক'লকাতার সিদ্ধেশ্বরী-তলার (কালীতলার) বিখ্যাত সুবর্ণবণিক বংশ দত্তদের প্রিয়লাল দত্ত বাবার বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে, তাঁদের সুপারিশে মোতী শীলের বাড়ির কর্তাদের অনুগ্রহে আমরা ভর্তি হ'লুম। তার পরে আমার আর দুই ভাই, সেজো ভাই সুজ্যোতিনাথ আর ছোটো ভাই বাসন্তীকুমার†, বিনা আয়াসে ঐ ইস্কুলে স্থান পেলে। দাদা ভর্তি হ'ল সপ্তম শ্রেণীতে, আমি অষ্টম শ্রেণীতে।** ছোটো ভাইয়েরাও অষ্টম শ্রেণী থেকে ঐ ইস্কুলে এল। এইভাবে আমরা চার ভাই, গরিব কেরানি ঘরের ছেলে, আট আট বছর ক'রে, ক'লকাতার এক শ্রেষ্ঠ ইস্কুলে, একটি পয়সা খরচ না ক'রে, লেখাপড়া করবার সুযোগ পাই। জীবনে আমাদের কয় ভাইয়ের যেটুকু প্রতিষ্ঠা, তা এইভাবে মহাত্মা মোতীলাল শীলেরই দয়ায়। তাঁর কথা মনে হ'লে, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা সহজেই নত হ'য়ে যায়, তাঁর চরণে আমাদের

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "আমার ছেলেবেলার কথা"।—অ।

† সুনীতিকুমারের এই দুই ভাই বর্তমানে আছেন ক'লকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বরানগরে নিজের নিজের বাড়িতে।—অ।

** "তখন ক্লাসের সংখ্যাকরণ অন্যভাবে হ'ত"—দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট' "হেড পণ্ডিত মশায়", প্রথম অনুচ্ছেদ।—অ।

কোটি কোটি প্রণাম আপনা থেকেই নিবেদিত হয়, নিজেদের পক্ষ থেকে, আর আমাদের মতো সহস্র সহস্র গরিব ঘরের ছাত্রদের পক্ষ থেকে। এই ইস্কুলের উপর ছায়ার মতো থেকে এর উচ্চ আদর্শকে জীইয়ে রেখেছিল মোতীলালের অশরীরী আত্মা আর আদর্শ তো বটেই, আর সঙ্গে-সঙ্গে নাম ক'রতে হয় ইস্কুলের শিক্ষকদেরও। অষ্টম শ্রেণীর ইংরিজির শিক্ষক অশ্বিনী-কুমার ঘোষ, সপ্তম শ্রেণীর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচায্য, ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, পঞ্চম শ্রেণীর ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি (ইনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন), চতুর্থ শ্রেণীর গিরিজাপ্রসন্ন মিত্র, তৃতীয় শ্রেণীর বিষ্ণুপদ পাঁজা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সুশীলকুমার নিয়োগী আর প্রথম শ্রেণীর বা এণ্ট্রাস ক্লাসের হেডমাষ্টার—প্রথমটায় নকড়ি ঘোষ, পরে জগবন্ধু ঘোষ। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয় প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, আর অন্য শিক্ষক রসরাজ ঘোষ আর হরিশ্চন্দ্র দাস, আর ড্রয়িং-শিক্ষক গোষ্ঠবিহারী শীল। এঁদের সকলের কাছ থেকে যে স্নেহ যত্ন হিতৈষণা পেয়েছি তার তুলনা নেই। ক্লাসে বয়সে ছোটো "ভালো ছেলে" ছিলুম, প্রত্যেক বৎসরই প্রথম হ'তুম, ইংরিজিতে খুব লায়েক ছিলুম ব'লেই বেশি খাতির—কিন্তু গণিতে অত্যন্ত পিছ্‌পা ছিলুম—ভালো নম্বর কখনও পেতুম না, যদিও কষ্টেসৃষ্টে পাসের মতো নম্বর পেয়ে সব ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থানটি কোনও রকমে বজায় রাখতুম। একবার পঞ্চম শ্রেণীতে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় অঙ্কে ১০০-র মধ্যে একটি পূরো গোল্লা—শূন্য মাত্র পাই। সুপারিণ্টেডেণ্ট ব্রজেনবাবু, আমাদের পঞ্চম শ্রেণী যাঁর তাঁবে ছিল—অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন—খুব ঢাঙা মানুষ, চাপকান-পাতলুন পাক-দেওয়া চাদর প'রে আসতেন, তাঁর হুংকারে অতি দুষ্ট বখাটে ছেলেরাও ভয়ে কাঁপত, আর তাঁর হাতের গাঁট্টা আর লম্বা বেতও ছিল ভীতিপ্রদ। আমার গণিতে এই ফল হওয়ায় তিনি আমাকে পরীক্ষার পরে আপিসে ডেকে পাঠালেন। খুব ক'ষে ধমক দিলেন—এরকম ক'রে যদি গণিতে গাফিলতি করি, তাহ'লে এণ্ট্রান্স পাস ক'রতেই পারবো না, ইস্কুলের বদনাম ক'রবো, ঠাকুদা বাবা ঠাকুমার মনঃকষ্টের কারণ হবো। মন দিয়ে অঙ্ক না কষার জন্য ভবিষ্যৎ কালের প্রতিষেধক হিসেবে মাথায় তিনি গুটি কতক গাঁট্টা মারলেন। সেই গাঁট্টার দাওয়াইয়ে কতটা ফল হ'ল তা জানি না—কিন্তু আর একটি ব্যবস্থা সেই সঙ্গেই তিনি ক'রলেন। হুকুম হ'ল—"কাল থেকে চারটেয় ইস্কুলের ছুটি হ'লেই বাড়ি যেতে পাবি না।

আমার সামনে আপিসে ব'সে ব'সে ঘণ্টাখানেক অঙ্ক ক'ষবি। আমি ছটা অবধি ইস্কুলেই থাকি।" এই-সব শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি বা গভীরতা খুব বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু যেটুকু তাঁরা জানতেন সেটুকু ভালো ক'রেই জানতেন, আর সব কিছু তাঁরা দরাজ হাতে ছাত্রদের কাছে উজাড় ক'রে দিতেন। ব্রজবাবুর সম্বন্ধে আমরা শুনতুম, সেকালের বহুপ্রচলিত ইস্কুল-পাঠ্য গণিতের বই Barnard Smith-এর Arithmetic-এর প্রশ্নাবলীর প্রত্যেকটি অঙ্কের উত্তর তাঁর মুখস্থ ছিল। যা হোক, এই ভাবে তো তিনি অযাচিত স্নেহ দেখিয়ে আমার গণিতের বিদ্যার উন্নতির ভার নিলেন। এর পরে, উঁচু শ্রেণীতে, কতকটা নিজের আগ্রহে ও পরিশ্রম ক'রে ভালো ফল পাওয়া গেল—১৯০৭ সালে যখন এণ্ট্রান্স পাস ক'রে বা'র হ'লুম, তখন গণিতের পূর্ণ সংখ্যা ১৬০-এর মধ্যে ১২২ পেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে, কুড়ি টাকার প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়ে with drums beating অর্থাৎ "ড্যাং-ডেঙিয়ে" পাস ক'রে গেলুম। ইস্কুলের জন্য গৃহশিক্ষক রাখার তেমন সংগতি ছিল না—অবস্থা বুঝে, হেডমাষ্টার জগবন্ধু ঘোষ মহাশয় নিজেই এসে বাবার কাছে প্রস্তাব ক'রলেন—"আপনার ছেলে এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ভালো ক'রবে, আমাদের নাম রাখবে, এই আশা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না—পরীক্ষার তিন চার মাস বাকি আছে—আমি এখন থেকে রোজ সন্ধ্যেয় এসে ওকে দু ঘণ্টা ইংরিজি পড়াবো, সংস্কৃতটাও একটু দেখে দেবো। কোনও চিন্তা ক'রবেন না—মাইনের কথাই নেই—ভালো ক'রে পাস ক'রলে আমাদেরই সার্থকতা।" এই ভাবে তাঁরা আমাদের স্নেহ দিয়ে মানুষ ক'রেছিলেন। আমাদের হেডপণ্ডিত মহাশয়—চতুর্থ শ্রেণী থেকে চার বছর ধ'রে যিনি আমাদের সংস্কৃত পড়ান—তাঁর চরিত্র অসাধারণ ছিল। ছেলে বয়সে তাঁকে "পাগলা পণ্ডিত" ব'লে আমরা ঠাট্টা ক'রতুম কিন্তু কখনও অবজ্ঞা করার চিন্তাই করি নি। তাঁর নিঃশব্দ উদাহরণ আমাদের চরিত্রকে গ'ড়ে তুলতে যে কতটা সাহায্য ক'রেছিল, তা এখন আমরা বুঝতে পারি। তাঁর সম্বন্ধে আমার প্রণাম নিবেদন ক'রে ইতিপূর্বেই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত ক'রেছি।*

যখন ১৯২২ সালে বিলেতে তিন বছর থেকে, দু বছর লণ্ডনে আর এক

* দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "হেড-পণ্ডিত মশায়"।—অ।

বছর প্যারিসে, আর তা ছাড়া বার্লিনে রোমে আথেন্সে—লণ্ডনের ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলুম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেলুম, তখন আমার পুরোনো ইস্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলুম। তাঁরা আমায় দেখে খুব খুশি। বিলেতের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ ধারণা ছিল না। উঁচু শ্রেণীর মাষ্টাররাও মনে ক'রতেন, আমাদের ভারতবর্ষের মতন, ইংলাণ্ডে তো বটেই, ইউরোপে অন্য সব দেশেও ইংরিজিই হ'চ্ছে উচ্চশিক্ষার বাহন। ইংরিজি ছাড়া অন্য ভাষা কী ক'রে হ'তে পারে? যখন ব'ললুম ফ্রান্স জরমানি ইটালি গ্রীসে তারা ইউনিভার্সিটিতে অনেকে ইংরিজি জানে না, ব'লতেও পারে না, নিজেদের সব ভাষায় ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ, এম-এ, ডক্টরেট প্রভৃতি পাঠ করে, পরীক্ষা দেয়—তাঁরা একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। একজন কৌতুহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তুমি ওসব দেশে গিয়েছিলে, ওসব ভাষা কিছু কি ব'লতে পারো?" ব'ললুম—"একটু একটু পারি।" তখন প্রশ্ন হ'ল, "আচ্ছা, বলো তো, ফ্রেঞ্চে What is thy name কী হবে?" আমি ব'ললুম, "'তুই' ব'ললে এক রকম, 'তুমি' বা 'আপনি' বল্‌লে আর এক রকম। Comment tu t'appelles 'কমাঁ ত্যু তাপেল', মানে 'তোর নাম কী?' Comment vous vous-appelez 'কমাঁ ভু ভুজাপ্লে', মানে 'তোমার বা আপনার নাম কী?'" "আর জরমানে?"—"জরমানে Wie heisst Du 'ভী হাইস্ট ডু' অর্থে 'তোর নাম কী?' আর Wie heissen Sie 'ভী হাইস্‌ন্ জী' অর্থে তোমার বা আপনার নাম কী?'"—এ কথা শুনে তো তাঁরা হেসেই আকুল। ইংরিজির বদলে এ ভাষা শিখে আবার ওদের দেশে বি-এ, এম্-এ, ডক্টর ডিগ্রি নিতে হবে? এ যেন কেমন অসম্ভব ব্যাপার।

এই যে লম্বা আটটি বছর ইস্কুলে কাট্‌ল, বেশ আনন্দের সঙ্গেই কেটেছিল। পড়াশুনোয় ভালো ছিলুম ব'লে প্রশংসা পেয়েছি। বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মায়ের ভালোবাসা আদর যত্ন পেয়েছি, তার স্মৃতি এখনও মনকে আকুল করে—আমার বয়স যখন বারো, তখন মা দেহরক্ষা ক'রলেন অকালে। বাবা ছিলেন, ঠাকুর্দা ছিলেন, আমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলবার জন্য তাঁদের কী না আগ্রহ আর চেষ্টা ছিল। ঠাকুমা অতি যত্নে অতি কষ্টে আমাদের চার ভাই

দুই বোনকে মায়ের চেয়েও বাড়া ক'রে মানুষ করেন। গরিবের ঘর, খুব গরিব না হ'লেও অভাব অসুবিধা নানা রকমের ছিল, কিন্তু সেগুলো আমরা বুঝ্তেই পারতুম না—তার জন্য কোনও চিন্তা ছিল না। আমরা এ বিষয়ে কখনও ভাবি নি, কিন্তু, পরবর্তী কালে বাবা আক্ষেপ ক'রে আমাদের ব'লেছেন, যেন কতকটা অপরাধীর মতন—"তোদের ভালো ক'রে মানুষ ক'রতে পারি নি—বর্ষাকালে তোদের একটি ছাতাও দিতে পারি নি—স্লেট মাথায় দিয়ে বা অন্য লোকের ছাতার কানাচের তলায় আশ্রয় নিয়ে ভিজতে ভিজতে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছিস, দেখে কষ্ট হ'ত, উপায় ছিল না, টাকা নেই।" কই, সে কথা আমাদের তো কখনও মনেই হয় নি। জুতো অনেক সময়ে ছিল না, খালি পায়েই সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে হ্যালিডে স্ট্রীটে গ্যাঁড়াতলায় ইস্কুলে তো বেশ আনন্দ ক'রতেই ক'রতেই যেতুম—গায়ে অনেক সময়ে একটা গেঞ্জি ছাড়া আর জামা জোটে নি ; মোতী শীলের ইস্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে কম দামের চীনে বাড়ির জুতো ছাড়া দাদার আর আমার আর কোনও পাদত্রাণ ছিল না। পরে ইস্কুলে ভর্তি হবার পরে, হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেড্‌ল Whiteaway Laidlaw ব'লে সাহেবদের বড়ো দোকান থেকে পূজোর সময়ে দাদার জন্য টাকা পাঁচেক দিয়ে এক জোড়া মজবুত বিলিতি ঘোড়-তোলা বুট জুতো* কেনা হ'ল, পেরেক মেরে তলাটা লোহার নাল দিয়ে আঁটা—এই জুতো আমরা চার ভাই পর-পর দুই-দুই বছর ক'রে আট বছর ধ'রে ব্যবহার করি। কিন্তু দুঃখু ছিল না। ঠাকুদ্দার ব্যবস্থায়, আর কিছু না হোক, খানিকটা ক'রে খাঁটি ঘী ভাতের সঙ্গে খেতে পেতুম। চালের মন দু টাকা আড়াই টাকা, চন্দ্রকোণার মট্‌কির দানাদার সুরভি ভয়সা ঘীয়ের মন বত্রিশ টাকা—ঠাকুদ্দা পশ্চিমে ছিলেন, দা'ল ঘীয়ের কদর বুঝতেন—মাছের তেমন ভক্ত তিনি ছিলেন না, তুলনায় মাছও ছিল আক্রা—শাক-সব্‌জি, আনাজ-তরকারি খুব বেশি আস্‌ত না—তিনি ব'লতেন "কলাইয়ের দা'ল বা মুগের দা'ল দিয়ে কণ্ঠা পর্যন্ত ঠেসে ভাত খাবি, আর তার সঙ্গে এক খাম্‌চা ক'রে ঘী—ব্যস, এইতেই শরীর ঠিক থাকবে।"

* 'ঘোড়' = 'গোড়'— উঁচু-গোড়ালি-ওয়ালা বুট-জুতো। বাঙলাতে কিছু দিশি আর তদ্ভব শব্দের উচ্চারণে অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ বর্ণ আর মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে অল্পপ্রাণ বর্ণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য *The Origin and Development of the Bengali Language*, Part 1, p. 439)। —অ।

তখন ৩।৪ আনার বাজারেই—আলু বেগুন পটল লাউ কুমড়ো শাকেই আর কিছু মাছেই পর্য্যাপ্ত হ'ত। আমাদের কাছে ঐ ঘী দিয়ে ঠাকুমা আর মায়ের হাতের রান্না দা'ল ভাত যেন অমৃতের মতো লাগ্‌ত, যেদিন বেশি ক'রে আলু-ভাজা হ'ল তো মনে হ'ল আজ "ফিস্টি" লেগে গেল। গুড়-তেঁতুল বা লেবু-চিনি মিশিয়ে অপূর্ব চাটনি বা আচারের কাজ হ'ত। মুখ বদ্‌লাবার জন্ম মাঝে মাঝে বাবা বড়োবাজারের তুলাপটির এক মারোয়াড়ী হালুইকরের দোকান থেকে তখনকার দিনের খাঁটি ঘীয়ে তৈরি পশ্চিমা মেঠাই আমাদের জন্য আনতেন—বেশি আনতে পারতেন না, কিন্তু সকলের কথা ভেবে যা নিয়ে আস্‌তে পারতেন তাই আমাদের কাছে ছিল যথেষ্ট—ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ মিষ্ট পক্কান্নের সঙ্গে এইভাবে অন্তরঙ্গ পরিচয়—হিঙ্‌-এর কচৌরী, সেউ দাল-মোট, কিশমিশের সিঙাড়া, মুগের লাড্ডু, গোলাপ-জাম, বর্‌ফী, মগ্‌দাল [?], পশ্‌দারী লাড্ডু, ইমিরতী—এ-সবের রসে আমাদের ছেলেরা বঞ্চিত হ'চ্ছে, চকোলেট ললিপপ কেক লজেঞ্জ বিস্কুট-এর টানে—এমন কি নামও জানছে না। বাড়িতে বাবাই আমাদের কয় ভাইয়ের পড়াশুনা দেখতেন। বাবার পড়াশুনা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পৌছায় নি—তাই, যখন উঁচু ক্লাসে প'ড়তুম, তখন তিনি খুব ভোরে উঠে H. C. Sur বা হেমচন্দ্র সুরের ইংরিজি-বাঙলা অভিধান দেখে আমাদের সেদিনকার ইংরিজি পাঠের কঠিন কঠিন শব্দের মানে খুঁজে খুঁজে বা'র ক'রে খাতায় লিখে দিতেন, সময়মতো ঠাকুদ্দাও অঙ্কতে সাহায্য ক'রতেন। বাবার একটা খুব আগ্রহ, যাতে আমরা ভালো ক'রে ইংরিজি শিখি। সেকালে উচ্চ শিক্ষা মানেই ভালো ক'রে ইংরিজির চর্চা, শেক্‌স্পিয়র, মিল্‌টন, শেলি, ব্রাউনিং, টেনিসন, ওঅড্‌স্‌ওঅর্থ, ডিকেন্স্‌, থ্যাকারে, অ্যাডিসন্‌, সুইফ্‌ট্‌ যার মুখস্থ নয়, সে আবার পণ্ডিত কিসের? অনেক বেশি ইংরিজি বই, কচিৎ সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত বইও, যাঁরা প'ড়তেন, তাঁদের Walking Library ব'লে সম্মান করা হ'ত। তখন লাইব্রেরির পাট বেশি ছিল না—আমাদের ইস্কুলে ছাত্রদের জন্য আলাদা লাইব্রেরি ব'লে কিছুই ছিল না। খালি মাষ্টার মশায়দের জন্য দু চারখানা বিনা পয়সায় পাওয়া পাঠ্যপুস্তক, আর অল্পদামী অভিধান ব্যাকরণ আর ছুট্‌কো ইংরিজি বই থাকৃত—এই যথেষ্ট। (এইরকম বইয়ের মধ্যে মাষ্টারদের ঘরের আধ-আলমারি বইয়ের মধ্যে আমি Prescott-র *Conquest of Mexico* পাই, সেখানা সবটা না বুঝেও প'ড়ে ফেলি, অসীম

কৌতূহল আর আনন্দ লাভ করি তা থেকে)। বাবা বই পড়ার কদর বুঝতেন। তিনি জানতেন, কেবল কখানি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রলে কিছু হয় না—পাঠের পরিধি সর্বদা বাড়াতে হয়। এই জন্য খুব বেশি ক'রে, সেকালের ভাষায়, ইংরিজি out-book অর্থাৎ পাঠ্যের বাইরেকার বই পড়া চাই। সে বই কিনে পড়াবার সংগতি ছিল না, তবে ক'লকাতার পুরোনো বইয়ের দোকানে, আর রাস্তায় ঢালা কম দামের ছেলেদের উপযোগী পুরোনো ইংরেজি বই দু-চার আনার পাওয়া যেত, বেছে-বেছে সে রকম বই বাবা প্রায়ই আমাদের জন্য কিনে নিয়ে আসতেন। আমাদের নিজে পড়াতেন। এই থেকে "গ্রন্থ-কীট" হবার একটা প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে ছেলেবেলাতেই জেগে ওঠে।

বাবার নিজের পড়ার অভ্যাস কিছু কিছু ছিল। বাড়িতে ঠাকুর্দার কেনা তিনটি বিরাট খণ্ডে কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কৃত মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ ছিল, সেটা তিনি মাঝে মাঝে প'ড়তেন। আমিও সেই বিশাল মহাভারত সাগরের কিনারায় ব'সে তার ঢেউয়ের মধ্যে আছাড় খেতুম—লোভ হ'ত, বইখানি প'ড়ে ফেলি, সাহস আর সময় হ'ত না। Oliver Goldsmith-এর কাব্য, নাটক আর গদ্যরচনার এক বড়ো সংগ্রহ ছিল, সেটা বাবা প'ড়তেন। তিন চারটে টীকা সমেত গীতার এক বড়ো সংস্করণ তিনি কিনে আনেন, সেটাও প'ড়তেন, আমার কিন্তু সাহস হ'ত না। আর নানারকম ইংরিজি নভেল বাবা সংগ্রহ ক'রে এনে প'ড়তেন, আর কিছু কিছু বাঙলা বইও। ইংরেজ সওদাগরি আপিসের কেরানির পক্ষে, ব'লতে হবে, বাবার পড়াশুনার দিকে খুবই ঝোঁক ছিল। তাঁর কাছ থেকে তার কিছুটা আমি পেয়েছিলুম সন্দেহ নেই। ১৯০৩ সাল, প্রথম অবনীন্দ্রনাথের ছবির মোহে পড়ি—সেই সময়ে বোধ হয় ক'লকাতায় ৮৬নং কলেজ ষ্ট্রীটে হ্যারিসন রোড (এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোড) আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আমেরিকানদের স্থাপিত Y. M. C. A. College Branch—তাতে কেবল কলেজের ছেলেরাই সদস্য হ'তে পারত—এর বাড়িতে ইস্কুলের ছেলেদের জন্য একটা YMCA Boys' Branch স্থাপিত হ'ল, সেটা আমার পক্ষে এক অভাবনীয় আনন্দের

ব্যাপার। এই Boys' Branch ছিল বাড়ি থেকে মোতী শীলের ইস্কুলে যাবার পথেই। বাড়িতে বাবার অনুমতি নিয়ে, সামান্য নামমাত্র চাঁদা দিয়ে, তার সদস্য হ'লুম। অনেক সুবিধে ছিল—ছেলেদের জন্য ব্যায়ামশালা, ছেলেদের জন্য ইংরিজি গল্পের বই আর ছবির বইয়ের লাইব্রেরি (বাঙলা বই তখন তেমন পাওয়া যেত না), নানা সান্ধ্য সম্মিলন, গান-বাজনার আড্ডা, Boys' Branch-এর পরিচালক ইংরেজ পাদরি Arthur Lefevre-এর সান্নিধ্য, তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যে বেলায় আলাপ-আলোচনা, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্রীষ্টান যাজক, অতি সজ্জন, বিদ্বান্ হৃদয়বান্ চরিত্রবান্ ব্যক্তি, তাঁর বক্তৃতা আর তাঁর উপদেশ, এঁর পুত্র হৃদয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালক হন পরে, তিনি বেশ অমায়িক মিশুক ব্যক্তি ছিলেন—এঁরা ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। আর আমার কাছে সব-চেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল এই Boys' Branch-এর লাইব্রেরি। আমার কাছে এ যেন এক নোতুন স্বর্গের দরজা খুলে দিলে। ছোটো বড়ো ছবিওয়ালা নানান্ রকমের ছেলেদের উপযোগী ইংরিজি বইয়ের এত বড়ো সংগ্রহ আগে দেখি নি। আমি তো গা ঢেলে দিয়ে এই-সব বই প'ড়তে মেতে গেলুম। Boys' Own Paper, Chatterbox প্রভৃতি সচিত্র ছেলেদের পত্রিকা পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়তুম—বিনা শ্রমে ইংরিজি ভাষার swing-এর মধ্যে অর্থাৎ তার অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবার পথ একটা পেলুম। G. A. Henty ব'লে [লেখকের লেখা] সে যুগে কিশোর বয়সের ছেলেদের উপযোগী ঐতিহাসিক কাহিনীর উপন্যাস সবগুলিই আস্‌ত। সেগুলি নিয়ে আর Andrew Lang-এর অদ্ভুত সুন্দর Fairy Books—নানা জাতির রূপকথার বই—H M. Brock ব'লে সে যুগের শিল্পীর রঙীন আর কালি-কলমের টানে আঁকা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছবিতে ভরা এই বইগুলি—এ সব নিয়ে কল্পলোকে বিচরণ ক'রতুম। Lefevre সাহেব আমায় খুব ভালোবাসতেন। পরে YMCA-এর অন্যতম পরিচালক হন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস নামক এক খ্রীষ্টান যুবক, ছেলেদের বড়ো ভাইয়ের মতন হ'য়ে যান, সকলেরই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পাত্র হন তাঁর বিদ্বত্তা আর চরিত্রবত্তার জন্য, আর সকলকে নানাভাবে সাহায্য করার আগ্রহের জন্য। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন, তিনিও মাঝে মাঝে Boys' Branch-এর ছেলেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রতে আসতেন, পরীক্ষার পূর্বে ইংরিজি ইতিহাস প্রভৃতি

বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তিনি ছিলেন কেশবচন্দ্র গুপ্ত—পরে তিনি ক'লকাতা পুলিস কোর্টের নামী উকিল হন; বাঙলার অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক হন—বরাবরই আমার প্রতি তাঁর স্নেহ অটুট ছিল। পরে কর্মক্ষেত্রে ঢুকেও কত বার তাঁর কাছে গিয়েছি, আমাকে তিনি ছোটো ভাইয়ের মতো দেখতেন, আমার স্ত্রীকেও তিনি আর তাঁর পত্নী অত্যন্ত স্নেহ ক'রতেন, আপনজন ক'রে নিয়েছিলেন—আমার একমাত্র পুত্রের [শ্রীসুমনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের] বিবাহে বৌমাকে [শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়কে] দেখে কেশববাবুর কী আনন্দ, কী আশীর্বাদ। আমার জীবনে তাঁর সঙ্গে এই সংযোগ YMCA Boys' Branch-এ আমার যোগ দেবার অন্যতম ফল।*

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো চরিত্রবান্ খ্রীষ্টান নেতার উপদেশ আমাদের নৈতিক জীবনও অনেক চিন্তাশীল অনেক উন্নত ক'রতে সাহায্য ক'রেছিল। আমি যখন YMCA Boys' Branch-এর সদস্য—প্রায় ৭০।৭৫ বছর আগেকার কথা—তখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলেরা সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রত, সকলের অন্ন আহার ক'রত না। বিলিতি বিস্কুট, মুর্গির ডিম দেওয়া কেক, মুসলমান খ্রীষ্টান-এর ছোঁওয়া বা পরিবেশন করা খাবার জিনিস খেত না।—আর অতি সহজ ভাবেই অন্য বর্ণের বা ধর্মের লোকেরা তাদের এই-সব আচার মেনে নিত—একটু ঠাট্টা ক'রলেও শ্রদ্ধা ক'রত। নিষ্ঠার সঙ্গে যে-সব ব্রাহ্মণ সন্তান চ'লত, তারা কষ্ট স্বীকার ক'রলেও একটু আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রত। ইস্কুলে পড়বার সময়ে যখন সুকিয়াস্ স্ট্রীট থেকে হাঁটা পথে লম্বা পাড়ি দিয়ে হ্যালিডে স্ট্রীট গ্যাঁড়াতলার মোতী শীলের ইস্কুলে সাড়ে দশটায় আস্তুম, আর চারটের পরে ইস্কুল ভাঙলে বাড়ি ফেরার পথেই বহুদিন YMCA Boys' Branch-এ এসে হাজির হ'তুম, সেখানে সন্ধ্যা ৭টা ৮টা অবধি থাকতুম—ব্যায়াম সভাসমিতি লাইব্রেরিতে পড়া সব তখন হ'ত, তখন এই টানা ৮। ১০

ঘণ্টা খাবারের নিয়মিত ব্যবস্থা আমার মতো বাড়ন্ত বয়সের ছেলের জন্য তেমন ভালোভাবে করা সম্ভব হ'ত না। সকালে অবশ্য দশটায় ভাত খেয়ে ইস্কুলে আসতুম—সঙ্গে বাড়ি থেকে টিনের কৌটো ক'রে কিছু জল-খাবার নিয়ে আসতুম, বেলা দেড়টায় সেটা খেতুম—খানপাঁচেক লুচি বা পরটা, আলুভাজা, বা একটু মোহন-ভোগ—এই যা। এটা সন্ধ্যা ৭টা ৭॥টা পর্য্যন্ত চালাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না—কিন্তু নানা নোতুন জিনিস দেখ্‌বার শোন্‌বার জান্‌বার উৎসাহে আমরা তা গায়ে মাখ্‌তুম না। তবে কোনও কোনও দিন ৪॥-টে ৫টার মধ্যে বাড়ি ফিরে, জলটল খেয়ে, আবার YMCA-তে এসে ৬টা ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত কাটাতুম। এই সময়ের মধ্যে YMCA-র পরিচালক Lefevre সাহেব কিংবা অন্য কর্তারা, ছেলেদের চা-বিস্কুট খেতে দিতেন—কোনও কোনও দিন Party থাকলে কচুরি, জিলিপি মিঠাই সন্দেশ সিঙাড়া তাঁরা পরিবেশন ক'রতেন স্বহস্তে, হিন্দু ছেলেদের খেতে দিতেন। কোনও প্রশ্ন বা সংকোচ না ক'রে সাধারণ হিন্দু ছেলেরা (যায় ব্রাহ্মণ ছেলেরাও) তা খেতে অভ্যস্ত হয়। YMCA-র এই রকম একটি Party-তে এই ভাবে জলখাবার পরিবেশন ও ভোজন চ'লছে, সেখানে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন উপস্থিত। তিনি নিজে ব্রাহ্মণের ছেলে, সব রীতিনীতি জানেন। সব কিছু দেখে, দু'টি ছেলের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ জমালেন। "তোমরা এখানে এই সাহেবদের, খ্রীষ্টানদেব ছোঁওয়া জিনিস খাচ্ছ—বাড়িতে তোমাদের মা-বাবা অভিভাবকেরা আছেন, তাঁরা কি খুব গোঁড়া, বা এসব বিষয়ে উদার ?" ছেলেরা একটু থত-মত খেয়ে, যেন কিছু অন্যায় ক'রেছে এইভাবে ঘাড হেঁট ক'রে স্বীকার ক'রলে, বাপ-মা কেউই এই খ্রীষ্টানের সঙ্গে ছোঁয়ালেপা পছন্দ ক'রবেন না—জানলে পরে তাদের ব'কবেন। তখন রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় ব'ললেন, "দেখো, এসব ছোঁয়ালেপার কোনও মূল্য নেই, এ ধরনের ব্যবস্থাতে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণাই প্রকাশ পায়। এ থেকে হিন্দু সমাজের মুক্তি পাওয়া উচিত ব'লেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু তোমরা এখন ছেলেমানুষ, স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নও। এ বিষয়ে সাহস থাকে তো বাপ-মার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিরাগভাজন হ'তে পারো। কিন্তু আমি বলি, তার দরকার নেই। বিষয়টা সামাজিক আর নৈতিক হ'লেও, আধ্যাত্মিক বিচার বা বিবেকের ব্যাপার নয়। পরে বড়ো হ'য়ে স্বাধীন হ'য়ে দায়িত্ব নিয়ে যা উচিত মনে ক'রবে তা ক'রতে

পারবে। এখন খ্রীষ্টান-ছোঁয়া খেয়ে বাড়িতে গিয়ে মিথ্যে কথা ব'লতে হবে, 'না খাই নি,' কিংবা 'হাঁ খেয়েছি' ব'লে বাড়িতে তাঁদের বিরাগ-ভাজন হ'তে হবে। তাব চেয়ে বরং এক কাজ করা কি ভালো না? আত্মসংযম করা। খেলে দোষ হয় না, কিন্তু আমি খাই নি। এই ভাবে সরলতার সঙ্গে সত্যের সঙ্গে চলা কি ভালো নয়?"—এঁদেব আদর্শ, এঁদের হৃদয় কী মহান্ কী উঁচু ছিল।

এইভাবে ভালো মন্দ নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৈশোরে মন মেজাজ শিক্ষা নিষ্ঠা গ'ড়ে উঠছিল। এই সময়ে দু'টি দিক থেকে আমার উপরে দুই বিরাট অভিজ্ঞতার ধকল এসে প'ড়ল। প্রথমটি হ'চ্ছে—বারো বছর বয়সে, ১০ই এপ্রিল ১৯০২ সালে মায়ের মৃত্যু। এর ফল—মানসিক স্বাতন্ত্র্যের গোড়াপত্তন। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হ'চ্ছে আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে নিয়ে—১৯০৩ সালে তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে (এণ্ট্রাস পরীক্ষার পূর্বের চতুর্থ শ্রেণীতে) পড়ি—আর ১৯০৪ সালে, তখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আমার মা, বাবার আর ঠাকুদ্দার বাড়ির তুলনায়, বড়ো ঘরের মেয়ে ছিলেন। বাবা-মা'র বিয়ে হয়েছিল ১২৮৬ সালের শ্রাবণ মাসে—ইংরিজি ১৮৭৯ সালে। বাবার জন্ম-তারিখ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯, ইংরিজি [১৬ মে] ১৮৬২। মায়ের জন্ম-তারিখ জানা যায় না, বিয়ের সময়ে বয়স ছিল ১২। টাব্‌নার মরিসন কোম্পানির মতো বড়ো এক ইংরেজ সওদাগরি হৌসের বড়োবাবুর বারো বছরের কন্যা, বিয়ে হ'ল এক বেকার কেরানির এণ্ট্রাস-পাস-না-করা চাকরির উমেদার ১৭।১৮ বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু কেমন চট ক'রে আমার মা গরিব শ্বশুরবাড়ির সংসারকে আপনার ক'রে নিলেন, তার কথা নানা প্রসঙ্গে বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুমার মুখে শুনেছি। নিজস্ব ব'লতে আড়াই কাঠা জমির উপর একটি পাকা বাড়ি, তিনখানি ঘর, ইটের তৈরি কাদার গাঁথুনি, একটি দালান, তার খোলার চাল, আর একখানি ঘর, তার ইটের গাঁথুনি খোলার চাল, একটু খোলা জমি। বাবা হেয়ার ইস্কুলে আর পরে সংস্কৃত কলেজের ইস্কুলে বোধ হয় ফোর্থ কি থার্ড ক্লাস অবধি পড়েন। এ তল্লাটে বড়ো-নদী দামোদরের পার—সোনাগাছি-সিংটি-শিবপুর গ্রামে ঠাকুদ্দার ঠাকুমার জন্ম ও বাল্যজীবন কাটে, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, রাজা

রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরের কাছে এই গ্রাম—আমার মাতৃকুলেরও আদি বাস ঐ সিংটি-শিবপুর গ্রামে—সেই সূত্রে বাঙালদেশ ফরিদপুর পাংশা থেকে আগত ভঙ্গ মহাকুলীন ভৈরব চাটুজ্জের তিন-পুরুষে' বংশজ পৌত্র আমার পিতৃদেব হরিদাস চাটুজ্যের বিবাহ হয়, মুখুজ্জে ঘরের জমিদার আর হৌসের বড়োবাবু নবগোপাল মুখুজ্জের দ্বিতীয়া কন্যা কাত্যায়নীর সঙ্গে।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ রবিবার

বিয়ে হ'ল ইংরিজি ১৮৭৯ সালে, তার কিছু পরেই বাবা ইস্কুল থেকে—সংস্কৃত কলেজ ["সংস্কৃত কলেজের ইস্কুল"] থেকে বিদায় নিলেন, ডিসেম্বর ১৮৮১ সালে। তখন ঠাকুদ্দার চাকুরি-বাকুরি নেই। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাবার চাকুরি হ'ল ১৮৮২ সালে, বাঙলা ১২৮৮, টার্নার মরিসন কোম্পানির আপিসে—মাসিক পনেরো টাকা মাইনের অ্যাপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবিশ কেরানির কাজ। মনে হয়, মাতামহের চেষ্টাতেই তাঁর আপিসেই এই কাজ তাঁর হয়। এখানেই বাবার পূরো ৪০ বছরের সুদীর্ঘ কর্মজীবন—১৮৮২ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত টানা ৪০ বছর ধ'রে। ১৫ টাকা থেকে মাইনে বছরে বছরে প্রথম প্রথম দু টাকা, পরে পাঁচ টাকা, দশ টাকা ক'রে বেড়ে শেষটায় বোধ হয় মাসিক টাকা তিনশোতে দাঁড়ায়। এই ভাবে "এক কলমে" প্রায় টানা ৪১ বছর যোগ্যতা আর সম্মানের সঙ্গে কাজ করবার পরে তার অবসর গ্রহণ করায়, আপিসের কর্তারা খুশি হ'য়ে যাবজ্জীবন মাসিক দেড়শো টাকা ক'রে তাঁকে পেন্‌শন্ দেয়—সওদাগরি ইংরেজের আপিসে এই পেন্‌শন্ দেওয়াটা তখন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। একটা থোক টাকা, এক হাজার দু হাজার বড়ো জোর, গ্রাচুইটি বা দান হিসেবে দিলে, তাতেই বাধ্য হ'য়ে লোকে খুশি হ'ত।

আমার ঠাকুদ্দা ছিলেন অতি সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, প্রায় ছয় ফুট ঢাঙা, সুগঠিত দেহ। আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রেছি, তার চোখের রঙ ছিল নীলাভ, একেবারে কালো রঙের নয়। আর তাঁর মাথার চুল কুচ্‌কুচে কালো ছিল না—একটু কপিশ, কটা বা লালচে ধরনের। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমায় একবার ব'লেছিলেন, উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক সময়ে এই দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ কান্তি, নীলাভ চক্ষু, মাথায় হিরণ্য বা স্বর্ণ বর্ণ কেশের শেষ পরিবর্তন এই কটা চুল, এখনও বহু স্থলে পাওয়া যায়—এটা

পতঞ্জলির বর্ণিত মগধের ব্রাহ্মণদের চেহারার মতন, দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, হিরণ্যকেশ, নীলনয়ন। মূল-আর্য্য পিতৃপিতামহদের দেহের গঠনের কি এটা অবশেষ? আমার বাবাও বেশ গৌরবর্ণ ছিলেন, তবে তিনি ঠাকুর্দ্দার মতো অত ঢাঙা ছিলেন না—৫ ফুট ৬ ইঞ্চির একটু উপর হবেন, তবে তাঁর চোখ একেবারে কালো ছিল না—একটু পিঙ্গল বর্ণ, আর তাঁর যৌবনের ফোটো দেখেছি—মাথার চুল যে বেশ কটা ছিল তা থেকে বোঝা যায়। আমার নিজের দৈহিক দৈর্ঘ্য বয়সকালে হ'য়েছিল ৫॥ ফুটের একটু উপর, আর ষোলে সতেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত মাথার চুল কটাশে' ছিল, তা বেশ মনে আছে। আমার পুত্রের মাথার চুলও তার দশ বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত বেশ কটাশে' ছিল। ক্রমে সব কালো হ'যে যাচ্ছে। এটা কি এই কয় পুরুষের মধ্যে লক্ষণীয় জাতীয় type বা দেহরূপের বর্দ্ধমান পরিবর্তন? আমার মা একটু শ্যামা ছিলেন, বাবার মতো ফর্‌সা ছিলেন না। বাবার চুরাশি বছর বয়স পর্য্যন্ত তার সঙ্গ পাই—তিনি দেহরক্ষা করেন ইংরিজি ৩রা আগস্ট ১৯৪৫ (বাঙলা ১৮ই শ্রাবণ ১৩৫২ সাল) —কিন্তু মা চ'লে যান ১০ই এপ্রিল ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে (২৭ চৈত্র ১৩০৮ সাল, বৃহস্পতিবার), তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর। মায়ের চেহারা পুরোপুরি মনে আসে না, কিন্তু মুখের আর দেহাবয়বের আদল এখনও কতকটা যেন ভুলি নি। মাথায় ঘোমটা, ডাগর চোখ হাসি হাসি মুখ, স্নেহভরা চাউনি —বড়োই মিষ্টি লাগত। আর মায়ের কাজের বিরাম কখনও দেখতাম না। রান্না-বান্না তো ক'রতেনই, নোতুন নোতুন অল্প খরচের কত রকম জলখাবার আমাদের জন্য ক'রতেন—এ কাজে ঠাকুমা তাঁকে সাহায্য ক'রতে আসতেন, কিন্তু মা তাতে বাধা দিতেন। সাজি মাটি দিয়ে কাপড বিছানার চাদর কাচা, গোবর কয়লার ঘেষ দিয়ে ঘুঁটের জন্য উনুনের গুল দেওয়া, ঘরের ঝাড পোঁচ করা, ঝুল ঝাড়া, সেলাই করা, পশমের বোনার কাজ নোতুন এসেছে সেই "উল-বোনা", খুঞ্চিপোশ তৈরি করা, কাঁথা সেলাই করা, লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, তারি মধ্যে আমাদের বর্ণ-পরিচয় পড়ানো—মাকে কখনো ব'সে থাক্‌তে দেখতুম না। তারই মধ্যে আবার তিনি সংসারের সুখদুঃখ নিয়ে "গান বাঁধতেন" তাঁর আঁকাবাঁকা অক্ষরের লেখায়—আজকালকার ভাষায় "কবিতা লিখতেন"—তার একটার দুই এক ছত্র এখনও মনে আছে—সেটা বাবার প্রতি গভীর সহানুভূতির কথা—আমার দেবতার মতন স্বামী, আমাদের জন্য কত

কষ্ট ক'রছেন, তাঁর মুখ দেখে আমার বুক যেন ফেটে যায়—মা দুর্গা, তুমি মা আমার প্রতি দয়া করো, তাঁর মুখে যেন তৃপ্তির হাসি দেখতে পাই—আর কিছুই চাই না—এই ধরনের কথা। এক টুকরো বাজে কাগজে মায়ের লেখা এই রকম একটি কবিতা বাবা মায়ের মৃত্যুর পরে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজের বিছানার শিয়রে রেখেছিলেন। আর আমাদের জন্য—চার ভাই দুই বোনের জন্য—তাঁর চিন্তার আর চেষ্টার অন্ত ছিল না। মাঝে কী জন্য জানি না, আমার দশ এগারো বছর বয়সে ভীষণ অরুচি হয়—কিছুই খেতে পারতুম না—মা অকুলানের সংসার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে আমার জন্য ভালো মিঠাই খাবার আমার রুচিমতো কিনে আনিয়ে আমায় খাওয়াতেন। একবার বাবার মনে হ'ল বাড়িতে ব'সে তিনি ব্যবসায় ক'রবেন, দু'টাকা যাতে উপায় হয়। তখন কেরাসিন তেলের রেওয়াজ ছিল খুব—উজ্জ্বলতম আলোর জন্য কেরাসিন তেলের ল্যাম্পই ছিল একমাত্র প্রধান পথ—রেড়ির তেলের মাটির প্রদীপ সর্বত্রই চ'লত, তার নীচে কেরাসিন তেলের কুপো বা টিমি বা লম্পো অর্থাৎ lamp তার ধোঁয়ায় চারদিক ভ'রে যেত—এ সবের উপরে হারিকেন ল্যাণ্টার্ন, আর বড়ো বড়ো তেলের টেবিল ল্যাম্প, চিম্‌নি-আর শেড-ওয়ালা, বেশি দামের ভালো কেরাসিনে যা জ্ব'লত; এই কেরাসিন তেল বিহারী ফেরিওয়ালারা এক এক টিন ক'রে কিনে এনে, তিন চার পাঁচ টাকায়, তা থেকে আট পয়সায় এক "বোতল" আর চার পয়সায় এক "পাঁট" ক'রে বিকালের দিকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি ক'রত। বাবা হিসাব ক'রে দেখলেন, তাঁর আপিসের সঙ্গে অন্য কারবার উপলক্ষ্যে সংযোগ আছে এমন এক মারোয়াড়ী মহাজন, যে টিন টিন কেরাসিন তেল শস্তা দরে কিনে এনে বাজার-দরে এই ফেরিওয়ালাদের বিক্রি করে, সে রাজি হ'ল, একটু কম লাভে শস্তা দরে একসঙ্গে ৩০। ৪০ টিন বাবাকে বিক্রি ক'রবে—ভালো তেল, আর আমাদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে সেই তেলের টিন রেখে, ফেরিওয়ালাদের এক-এক টিন ক'রে দু চার আনা শস্তায় আমরা দিতে পারবো—এতে আমাদের কিঞ্চিৎ লাভ থাকবে। মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের নামটি ছিল বোধ হয় বনসীধর হরদয়াল। মিষ্টিমুখ সজ্জন ব'লে মনে হ'ল। এই ৩০।৪০ টিন তেল কেনবার টাকা কই? মা তখুনি তাঁর দু চার খানি গয়না সব বাবাকে এনে দিলেন। নারকেলডাঙায় শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে খালের উপর দিয়ে যে রেলের সাঁকো,

তার পাশেই ছিল বন্‌সীধর হর্‌দয়ালের আড়ৎ। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বাবা পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমি বন্দোবস্ত মতো না'রকলডাঙার গুদাম থেকে গোরুর গাড়ি ক'রে তেলের টিন নিয়ে, গোরুর গাড়ি চ'ড়ে সুকিয়াস্ স্ট্রীটে বাড়িতে আনতুম। কিছু দিন ব্যবসা বেশ চ'লল—উঁচু দরের ভালো তেল মহাজন দিচ্ছিল—কিন্তু গরিব বাঙালী বাবুকে মেরে সে আরও দু'পয়সা করবার মতলব ক'রলে—বিভিন্ন দরের তেলের টিন হ'ত—Tiger বা বাঘ মার্কা, Rising Sun বা উঠন্ত সূর্য্য মার্কা, আর সব-চেয়ে ভালো Snow White নামে তেল—কম দামের বাজে তেলে Snow White-এর টিন ভ'রে আমাদের দিতে লাগল। ফেরিওয়ালারা চট ক'রে ধ'রে ফেললে—বেশি দামে কেনা Snow White-এর টিনের মধ্যে থেকে নিরেস Tiger বাঘ মার্কা তেল বেরুতে লাগল—আমাদের খদ্দের ফেরিওয়ালারা ক্রমে ঝগড়াঝাটি ক'রে একে একে ভেগে প'ড়ল—মায়ের গয়নার টাকা যা এই তেলের ব্যবসায়ে লাগানো হ'য়েছিল সব উবে গেল। কিছুদিন ধ'রে একটি খাতায় ক'রে এই-সব তেলের হিসেব আমিই রাখতুম—অজ্ঞ অপটু বাঙালীর বাণিজ্যে পুনরবতরণের এই অক্ষম প্রযাস এই ক্ষুদ্র একটি হাস্যকর কাহিনীর সঙ্গে এই ভাবেই দশ বছর বয়সে আমায় জড়িত হ'তে হ'য়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে মায়ের যে স্বার্থত্যাগ, সংসারের উন্নতির জন্য, বাবার চিন্তা লাঘব করবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা দেখেছিলুম, তা ভোল্‌বার নয়—মাকে এজন্য আমার বালক-মনের ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা জানাবার তো সৌভাগ্য হ'ল না।

এইরূপ সহজ ভাবে শিশুকাল থেকে বেশ আনন্দে জীবন কাটছে। শরীর বেশ ভালো যাচ্ছে, মন আনন্দে আছে। কিন্তু জীবনের এক বড়ো ব্যাধি, সারা জীবন যা নিয়ে ভুগেছি, তা প্রথম দেখা দিলে বা ধরা প'ড়ল আট বছর বয়সে। খুব শিশুকালে, ৫ কি ৬ বছর বয়সে কী ক'রে জানি না, এক অজ্ঞাত ব্যাধিতে অকর্মণ্য হ'য়ে প্রায় শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকি প্রায় ৬ মাস। তখন সেই ব্যাধির স্বরূপটি চিকিৎসাশাস্ত্রে ধরা পড়ে নি—সাধারণতঃ তাকে শিশুদের পক্ষাঘাত--Infantile Paralysis বলা হ'ত। এখন এই রোগের প্রকৃতি আর পরিচর্য্যা জানা গিয়েছে—শুনেছি, এই অসুখের এখনকার নাম হ'চ্ছে

Polio. আমার এইটুকু মনে আছে, আমি কয় মাস ধ'রে মোটেই হাঁটতে, চলাফেরা ক'রতে পারতুম না। খালি সারা দিন বিছানায় শুয়েই থাকতুম, মাঝে মাঝে উঠে ব'সতে পারতুম, ঘ'ষটে ঘ'ষটে, বিছানার মধ্যেই একটু আধটু নড়াচড়া ক'রতুম। চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা হয় নি। পারিবারিক চিকিৎসক কেশববাবু ছিলেন—কেশবচন্দ্র দত্ত—ঠন্ঠনের শঙ্কর ঘোষের কালী মন্দিরের পশ্চিমের লাগাও বাড়িতে থাকতেন, সেকেলে L. M. S. পাস-করা ডাক্তার, খুব বিচক্ষণ, হৃদয়বান্ ব্যক্তি, টাকার কঞ্জুস ছিলেন না, তিনি আমাকে দেখ্তেন। একদিন অন্তর আমাকে দেখে যেতেন, পায়ে হেঁটে গলায় stethescope ঝুলিয়ে আসতেন। তাঁর দর্শনী ছিল মাত্র দুটি টাকা—তা সে যুগের পক্ষে [এখনকার] দশ টাকার কাছাকাছি হবে। তাঁকে বড্ড ভয় ক'রতুম। নানা রকমের ওষুধ তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমায় দেখে দেখে দিতেন—প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখতেন প্রত্যেক বার—সে যুগের ডাক্তারি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন কতকটা লাটিনে কতকটা ইংরিজিতে হ'ত—বাঙালী ডাক্তাররা মেডিকাল কলেজে তাই শিখত—℞—অর্থাৎ Recipe "এই সব ওষুধ নিয়ে মেশাও"—এই শব্দ দিয়ে আরম্ভ হ'ত। আজকালকার ১৬। ৩২। ৬৪ টাকার ডাক্তাররা অনেকেই যেমন নমুনা হিসাবে পাওয়া নানা রকম antibiotic tablet অনেক রকমের রোগীর ঘাড়ে চালান, সে-রকমটি ছিল না। ২ টাকা ৪ টাকা ভিজিটের ডাক্তাররা বেশ সময় দিতেন, কখনও কখনও রোগী দেখ্‌তে দেখ্‌তে তামাক খেতেন, বাড়িতে ভালো মন্দ কিছু রান্না হ'লে তাও তাঁদের চেখে দেখতে হ'ত—রোগীর পথ্য যবের মণ্ড রোগীর জন্য মশিনার পুলটিশ প্রভৃতি ক'রে দেখাতেন। ধুতি কোট চাদর পরা কেশববাবু ডাক্তার আস্‌তেন দুপুর বেলায়—বাইরের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হুংকার দিতেন ঠাকুদ্দাকে ডেকে—"ঈশ্বরবাবু!"—অমনি আমি ভয়ে আঁত্‌কে উঠ্‌তুম—চুপ ক'রে শুয়ে থাকতুম। কিন্তু এঁরই চিকিৎসায়, মাস ছয়েক শয্যাশায়ী থেকে, আমি নিরাময় হ'য়ে উঠ্‌লুম। বিছানায় শুয়ে কেবল টিনের তৈরি ঘোড়া আর গাড়ি বিছানায় চালিয়ে আমার একমাত্র খেলা ছিল। যে দিন কেশববাবু আমায় প্রথম ঝোল-ভাত খেতে দিলেন, দেয়াল ধ'রে ধ'রে যখন আমি বেশ চ'ল্‌তে পারছি, তখন বেশ মনে আছে, ঠাকুমা মা সকলের চোখে মুখে আনন্দ। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঠাকুদ্দা এক টাকায় একটা বড়ো রুই মাছ আর দু টাকার সন্দেশ কিনে কেশববাবুর বাড়িতে নিজে গিয়ে দিয়ে এলেন।

এই Infantile Paralysis বা Polio থেকে তো সেরে উঠলুম, কিন্তু সে-যুগে একটা কথা বা বিশ্বাস ছিল, এই শিশুকালের রোগ হ'লে রোগী বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার একটা অঙ্গহানি হ'য়ে যায়। এই রোগ নাকি তার চিহ্ন রেখে গেল আমার দৃষ্টিশক্তিকে খর্ব ক'রে— Myopia বা Shortsightedness —আমার চোখ খারাপ হ'ল অসুখ সারার সঙ্গে সঙ্গেই। সেইটাই আমার জীবনের সব-চেয়ে প্রধান ব্যাধি। বাড়িতে পড়াশুনা ক'রছি, ৬। ৭ বছরের ছেলে, Calcutta Academy-তে যাই, ছবি দেখার ও ছবি আঁকার খুব শখ, খড়ি দিয়ে মেঝেতে বড়ো বড়ো ক'রে ঘোড়া হাতি উট মানুষ ঘোড়ার-গাড়ি মন্দির সব আঁকি, চোখ যে খারাপ সে কথা ধরাই পড়ে নি, জানতেই পারি না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার ক'রলেন এক ডাক্তার—আমার খুব high power myopia—আমাদের পাড়ায় স্থকিয়াস্ স্ট্রীটে এক আর্মেনিয়ান বণিক বাস ক'রতেন, তাঁর নাম ছিল Sookias, বোধ হয় Peter Sookias—পয়সাওয়ালা লোক। আমহার্স্ট স্ট্রীট (এখনকার রাজা রামমোহন সরণি) আর আপার সার্কুলার রোড (এখনকার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড)—এই দুইয়ের মাঝে বাদুড়বাগান পল্লীতে তাঁর বিরাট বসতবাড়ি, বাগান, পুখুর সব ছিল—বোধ হয় ১৮০০-১৮৫০ সালের কথা। তিনি খুব দয়ালু পরোপকারী মানুষ ছিলেন, সন্তানাদি ছিল না। তাঁর এই বাড়ি আর জমি তখনকার দিনের ক'লকাতা মিউনিসিপালিটির হাতে দিয়ে যান তাঁর নামে একটি "ধর্মদেয়" বা "দাতব্য চিকিৎসালয়" করবার জন্য। খুব উঁচু উঁচু ছাতওয়ালা বড়ো বড়ো ঘরের এক-তলা বাড়ি, গাড়ি-বারান্দা—প্রত্যেক দিন ৩০।৪০।৫০ জন রোগী, বাঙালী ভদ্রলোক আর বিহারী উড়িয়া আর অন্যজাতীয় শ্রমিক, চিকিৎসার জন্য সকাল ৮॥ থেকে ১১টা ১১॥ পর্য্যন্ত ভীড় ক'রত। একজন ডাক্তার, দুজন কম্পাউণ্ডার আর বেহারা দরওয়ান কেরানি—এ-সবও ছিল। মিউনিসিপালিটি থেকে এদের বেতন দেওয়া হ'ত। কম দামের ওষুধ, জ্বরের মিক্শ্চার, ঘায়ের মলম, বাতের তেল, শারীরিক যন্ত্রণার জন্য মশিনার পুলটিশ, এ-সব বিনা পয়সায় রোগীদের দেওয়া হ'ত। একটা ঘরে, মস্ত এক চুল্লীতে লোহার কড়ায় তৈরি হ'চ্ছে মশিনার পুলটিশ, তার উগ্র গন্ধে ঘর মাত হ'য়ে থাকত। এক পাশে একটি বিছানা, সেখানে রোগীর ফোড়া-কাটা প্রভৃতি ছোটোখাটো অস্ত্রোপচারও হ'ত। কৌতূহলী নয়ন আর মন নিয়ে, সামান্য অসুখের ছুতো ক'রে, বহু দিন এই

দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে, খুব আনন্দ পেয়েছি। ডাক্তারটি তখন ছিলেন প্রবীণ মানুষ—লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরনে চাপকান, পেণ্টুলেন, মাথায় টুপি—নাম ছিল তাঁর, যত দূর মনে প'ড়ছে, ক্ষীরোদ বাবু। তাঁকে দেখে মোটেই ভয় ক'রত না, ছোটো বড়ো সকলেই নিঃসংকোচে তাঁর সঙ্গে কথা কইত। এক দিন সকালে আমি ঠাকুদ্দার সঙ্গে ডিস্‌পেন্সারিতে আমার কী ছোটো অসুখ হ'য়েছে তাই দেখাতে গিয়েছি, ক্ষীরোদবাবু যথারীতি নাড়ি টিপে, জিভ দেখে, পেট টিপে ঠাকুদ্দাকে রোগের বিষয়ে জিগ্‌গেস ক'রে আমার ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখতে আরম্ভ ক'রেছেন, তিনি এক তক্তপোষের উপরে তাঁর চেয়ারে ব'সে সামনের টেবিলে লিখছেন, আমার খেয়াল হ'ল—আমি একটু উঁচু হ'য়ে তিনি কী লিখছেন দেখবো—অবশ্য কিছুই বুঝবো না। ক্ষীরোদবাবু আমাকে দেখে ব'ললেন, "খোকা, কী দেখতে চাও? ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারছ না?" আমি ভালো ক'রে দেখতে পারছিলুম না। তখন তিনি ব'ললেন, দূরে দেয়ালে বড়ো ঘড়ি ছিল—"দেখে বলো তো, কটা বেজেছে?" সাধারণ চোখ থাকলে আমার দেখতে পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি পারলুম না। তখন তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে নিজের হাত একটু উঁচুতে তুলে ব'ল্‌লেন, "দেখতে পাচ্ছ, কটা আঙুল?" ঠিকমতো না পারায় একখানা বই খুলে তাঁর সামনে দূরে কাছে ধ'রে দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা ক'রলেন, তার পরে মুখ গম্ভীর ক'রে ব'ললেন, "খোকা, তোমার বয়স কত?" ঠাকুদ্দাকে ডেকে ব'ললেন, "চাটুজ্জে মশাই, আপনার নাতির দেখছি জোর Myopia, দূরে দেখ্‌বার শক্তি কম, আপনি এখনি কোনও ভালো চোখের ডাক্তারের কাছে ওর চোখ দেখান, আর ইস্কুলে পড়াশুনো বন্ধ ক'রে দিন—চোখ ওর নইলে বড্ড খারাপ হ'য়ে যাবে।" "পড়াশুনো বন্ধ ক'রে দিন—নইলে ওর চোখ বড্ড খারাপ হ'য়ে যাবে"—দুটো কথা তখনি আমার বুকে যেন শেলের মতন বিঁধতে লাগল। পড়াশুনো ছবি-আঁকা সব বন্ধ হ'য়ে যাবে? তবে কি আমি অন্ধ হ'য়ে যাবো? তা হ'লে বেঁচে থেকে কী লাভ? ভয়ানক ভয় হ'ল মনে, কান্না পেতে লাগ্‌ল।[১০]

ঠাকুদ্দা আশ্বাস দিয়ে হাত ধ'রে বাড়ি নিয়ে গেলেন। সব শুনে, ঠাকুমা আর মা বিশেষ ক'রে বিচলিত হ'য়ে প'ড়লেন। সন্ধ্যের পরে বাবা আপিস থেকে আসতে, ঠাকুদ্দার কাছে ক্ষীরোদ ডাক্তারের কথা শুনে বাবা আমাকে অভয় দিয়ে ব'ললেন, স্নেহের সঙ্গে আমাদের "শূয়ার" ব'লে ডাকতেন—"শূয়ার, এর

জন্ত কী হ'য়েছে ? ক'লকাতার সব-চেয়ে ভালো ডাক্তারকে দিয়ে দেখাবো—বড়ো জোর একজোড়া চশমা তোকে প'রতে হবে। এমনি কত ছেলের চোখ ভালো থাকে না। তবে বুড়ো বয়সে না হ'য়ে ছেলে-বয়সে চশমা—এর জন্ত তোকে ঠাট্টাঠুট্টি ক'রবে তোর ইস্কুলে—এই যা।” তার পরে ব'ললেন, তখনকার দিনে ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসু বাঙালী আর ভারতীয়দের মধ্যে সব-চেয়ে নাম-করা চোখের ডাক্তার হ'য়েছিলেন ; খেঙরাপটিতে বটকৃষ্ট পালের বিখ্যাত ওষুধের দোকানে তিনি তখন ব'সতেন, নিজের বাড়িতেও রোগী দেখতেন—ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্রের বাবা প্রসন্নকুমার বসু টারনার মরিসন কোম্পানির আপিসে বাবার সহকর্মী ছিলেন, বিশেষ মিত্র ছিলেন, তাঁর কথায় আমার চিকিৎসার বেশ ভালো ব্যবস্থাই হবে। এ-সব কথা শুনে মনে একটু সাহস হ'ল। তার পরে যথাকালে কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় অতি যত্ন ক'রে চোখ দেখে চশমা দিলেন, একেবারে মাইনাস্ চারের শক্তির চশমা, বয়সের পক্ষে একটু বেশি খারাপ বটে। তখন আমার বয়স আট কি নয়। তখন থেকেই চশমা আমার দেহের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, বয়সের সঙ্গে, কতকটা নিজের গাফিলতির জন্যও বটে, মাইওপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা বেড়েই চলল —সপ্তম শ্রেণী minus 4, পঞ্চম শ্রেণী minus 5·5, এণ্ট্রান্স পাস ক'রে minus 6·5, তার পরে বি-এ ক্লাসে প'ড়তে প'ড়তে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ফুটবল খেলতে খেলতে খুব জোরে ফুটবল বাঁ চোখে এসে লাগে—কয় মাস ধ'রে চোখে ভীষণ ব্যথা ছিল, বকুনি খাবার ভয়ে সে বিষয়ে বাবাকে কিছুই বলি নি। তাতে ঐ চোখের power আরও বেড়ে যায়—চোখটাও যেন কেমন একটু ছোটো হ'য়ে যায়—[বাঁ] চোখের power হয় minus 12, আর ডান চোখের minus 9। এম-এ পাস করার সময় দুই চোখের অবস্থা ছিল minus 9 (ডান চোখে) আর minus 12 (বাঁ চোখে) ; এ সত্ত্বেও ভালোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হ'য়ে যাই, আর সব-চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, ভাগ্যের কথা, এর পরে চোখ আরও কিছুটা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আমি ঐ প্রায় আধ-কানা চোখ নিয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে ইউরোপে গিয়ে দুই বছরের জন্ত (পরে তিন বছরের জন্ত) সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করবার জন্য বৃত্তি পাই, আর তাতে ক'রে দু বছর লণ্ডনে এক বছর প্যারিসে কাটাতে পারি, ইউরোপের কতকগুলি দেশ দেখতে পারি (যেমন জরমানি, ইটালি, গ্রীস), আর লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অভ-লিটারেচার হ'য়ে ফিরে আসতে পারি। এই ব্যাপার অতি সহজ সোজা ভাবেই হ'য়েছিল, এতে কোনও বাঁকা পথ অনুসরণ ক'রতে মিথ্যাচার ক'রতে হয় নি। পরে এ প্রসঙ্গে আবার আসবো। আট বছর বয়সে যখন জানলুম, আমার চোখ এত খারাপ যে পড়াশুনা বন্ধ ক'রতে হ'তে পারে, তখন আত্মহত্যার কথা, ছেলে মনে, ভেবেছিলুম। আর এখন তো এই অর্ধান্ধ অক্ষি নিয়ে জীবনের ৮৬ বৎসর কাটিয়ে দিলুম—নিজের জীবনকে ভালো-মন্দ সু-কু দুই নিয়ে তো কেউ কর্মবিরল ব'লবে না—কিন্তু কী ক'রে সম্ভব হ'ল? আমি তো জানি না— কিছু জানতে পারলুমও না, এ জীবনে জানা যায়-ও না। তৎ সৎ—মৃত্যুর পরে কি এ রহস্যের সমাধান হবে? যাই হোক, সেই অজ্ঞাত যদি কিছু থাকে যার ব্যবস্থায় এই সব হ'চ্ছে—তার প্রতি নিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

মোতী শীলের ফ্রী ইস্কুলে ১৮৯৯ সালে ঠন্‌ঠনের দোয়ারী দত্ত মহাশয়ের ছেলে বাবার বন্ধু প্রিয়লাল দত্তের একটু সুপারিশে আমরা দুই ভাই তো ভর্তি হ'লুম। আমাদের পড়াশুনা ভালোই চ'লত। ক্লাসে আমি প্রথম থেকে "ফার্স্ট বয়" হ'য়ে গেলুম। প্রায় গোড়া থেকেই, অষ্টম কি সপ্তম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন থেকেই, চশমা নিতে হ'ল। ক্লাসে ছেলেরা ঠাট্টা ক'রতো, কেউ বা কাগজের চশমা প'রে আমাকে ভেঙ্‌চাত, যেন আমার চশমা শখের চশমা। মনে মনে ভারি রাগ হ'ত, কিন্তু উপায় ছিল না। এরই মধ্যে জীবনের উপরে প্রথম মৃত্যুর আঘাত এসে প'ড়ল—১৯০২ সালে ১০ই এপ্রিল (২৭ চৈত্র ১৩০৮ সাল, শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া রাত ১১টায়) নিতান্ত অনাশঙ্কিত ভাবে আমাদের বাড়িকে ছন্নছাড়া হতশ্রী ক'রে দিয়ে গেল, বাবা ঠাকুরদা ঠাকুরমা আমরা চার ভাই দুই বোন সকলকেই যেন আশ্রয়হীন ক'রে দিয়ে গেল মায়ের আকস্মিক মৃত্যু। প্লেগ ব্যাধি মহামারী রূপে দেখা না দিলেও, তখন যে চুপিসাড়ে ক'লকাতার শহরে তার নিঃশব্দ পদচারণ শুরু ক'রেছে তা কে জানত? দুই দিনের প্লেগের আক্রমণে মা আমাদের তাঁর নিজের হাতে গড়া বুকের মধ্যে রক্ষা করা সংসার ছেড়ে, সজ্ঞানে চ'লে গেলেন। এক মঙ্গলবারে তাঁর সামান্য জ্বর হয়, বুধবার সেই জ্বর বাড়ে, ডাক্তার ডাকা হয়, ডাক্তার বিশেষ কিছু বলেন না, মুখ ভার ক'রে চ'লে যান। মা যেন বুঝতে পারেন তাঁর ডাক এসেছে, বাড়ির বৌ, ঠাকুমাকে

ডেকে ব'ললেন, "মা, মনে হ'চ্ছে আমি আর উঠবো না। কাল বেস্পতিবার, বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো, কী হবে, কোনও দিন তো এই লক্ষ্মীপুজো বন্ধ হয় নি, তার ব্যবস্থা কে ক'রবে ?" বাড়িতে প্রত্যেক লক্ষ্মীপুজোর দিন মা নিয়মমতো উপোস ক'রে লক্ষ্মীপুজো করাতেন পুরুত ডেকে। একেবারে শয্যাশায়ী, বুঝতে পারলেন আর উঠতে পারবেন না, পূজা বন্ধ থাকায় বাড়ির অকল্যাণ হবে এই চিন্তা-ই যেন মাকে কাতর ক'রে তুল্‌ল। ঠাকুমা মায়ের শিয়রে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে আশ্বাস দিলেন, কিচ্ছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু মায়ের চোখে জল থামে না। এদিকে ডাক্তারের কথা শুনে বাবাও বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছেন—পাশের ঘরে তক্তপোষের উপরে দাদা উপুড় হ'য়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছে।—মাকে আমরা ঠাকুমার দেওয়া ডাকনাম ধ'রে "মা" না ব'লে "বৌমা" ব'লতুম—বাবা জিজ্ঞেস ক'রলেন, "কী হয়েছে রে ? কাঁদছিস কেন ?" দাদা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ব'ললে, "ডাক্তারবাবু ব'লে গেছে বৌমা বাঁচ্‌বে না—চ'লে যাবে—বৌমাকে আর দেখতে পাবো না।" বাবা কখনও আপিস কামাই ক'রতেন না। বুধবার দিনও বোধ হয় আপিস গিয়েছিলেন, সেদিন আশঙ্কার কথা জানেন নি। বৃহস্পতিবার দিনও তিনি আপিস যাবার কথা বোধ হয় ভাবছিলেন—মা বুঝতে পেরে মিনতির সঙ্গে ব'লেছিলেন—"দেখ, আজকের দিনটা ভালো মনে হ'চ্ছে না, হয়তো আজকের মধ্যেই জীবন শেষ হ'য়ে যাবে—আজ আর বাইরে যেও না, আজকের দিনটা তুমি কাছে থাকো।" বাবার আপিসে জরুরি কাজ—বড়ো আপিসের confidential clerk—মনের মধ্যে দোটানা অবস্থা খানিকক্ষণ ছিল, তবে তিনি বাড়িতেই থাকবেন স্থির ক'রলেন। তবে আপিসে কর্তাদের চিঠি লিখে জানাবেন ঠিক হ'ল যে ঐ দিন তিনি আপিসে যাবেন না—বাড়িতে স্ত্রীর অত্যন্ত সঙ্গীন অসুখ। একখানা চিঠি লিখে দিলেন, আমার উপর ভার প'ড়ল, ট্রামে ক'রে আমি লালদীঘীর উত্তরের রাস্তা লায়ন্‌স্ রেঞ্জ-এ বাবার আপিসে গিয়ে, বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে চিঠিখানা দিয়ে আস্‌বো। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা, চিঠি নিয়ে গেলুম। বাবার সহকর্মীরা আপিসের দরওয়ানেরা বাবাকে খুব ভালোবাস্‌ত, আমাকে দেখে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ ক'রতে লাগল, একজন বড়ো কেরানি আমাকে বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করাতে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বড়ো সাহেবের নাম ছিল Mr. Profytt প্রফিট্, তিনি, আর Mr. Price প্রাইস্, দুজনে ব'সে

ছিলেন। আমি গিয়েই চিঠিখানি দিয়ে ব'ললুম, Sir, I am Babu Haridas Chatterji's son. চিঠিখানি নিয়ে প'ড়ে সাহেব স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, What's wrong with your mother, my boy? একটা অজানা ভয় তখন আমার মনে এসে প'ড়ল, Sir, she is going to die—she has got plague. তার পরে বোধ হয় আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। সাহেব আমার কাঁধে হাত দিয়ে ব'ললেন, Don't cry, my boy; she will be all right. Tell your father not to come to office now. তার পরে আমি বেরিয়ে এলুম কেরানিবাবুটির সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নামবো, এমন সময়ে বেহারা এসে ব'ললে, "খোকা বাবু, এসো, সাহেব তোমায় ডাক্‌চে।" কী ব্যাপার—ঘরে ঢুকলুম—দুই সাহেবই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ব'সে। আমায় দেখে বড়ো সাহেব ব'ললেন—Look here, my boy, when you grow up, you will come and work in your father's office, eh? আমি আর কী ব'লবো—খালি Thank you sir, yes. ব'লে চ'লে এলুম। তার পরে, আপিসের বাবুরা ঘিরে জিজ্ঞেস ক'রতে লাগলেন, বড়ো সাহেব কী ব'ললে? আমি কোনও রকমে বেরিয়ে প'ড়ে লালদীঘীতে এসে শ্যামবাজারের ট্রামে (দু'ঘোড়ার ট্রামে) উঠে ব'স্‌লুম—বাড়িতে মায়ের কী অবস্থা তা জানবার জন্য মন আনচান ক'রছে। সেদিন বাড়িতে হাঁড়ি না চড়্‌বার মতো অবস্থা। দিদিমা, মামারা, মাসিদের দুই একজন, ছোট পিসি, সব এসে প'ড়্‌লেন। মামার বাড়ি থেকে এক ঠানদিদি, রাঙা দিদি, এলেন, তিনি দাল ভাত চড়িয়ে দিয়ে সকলকে খাইয়ে দিলেন। বাবার মামা, পাড়ায় থাকতেন, তিনি এসে ঠাকুদ্দার সঙ্গে জল্পনা ক'রতে লাগ্‌লেন। ডাক্তারের ওষুধের অত হাঙ্গামা তখনকার দিনে ছিল না। কাপড়ের পুঁটুলি ক'রে বরফ দেওয়া হ'তে লাগল। সন্ধ্যের দিকে মা বাবাকে ডেকে ব'ললেন, "দেখ, আমি যাচ্ছি, এখন লজ্জা ক'রো না গুরুজনেরা র'য়েছেন ব'লে, আমার শিয়রে তুমি ব'সো, আমার গায়ে তোমার হাত রাখো, আমি এই ভাবেই বিদায় নিই।" রাত্রি দশটার দিকে শেষ শ্বাসের লক্ষণ। তখনকার যেমন বিশ্বাস ছিল, খাটের উপরে শুয়ে ম'রতে নাই, মাকে পাঁজা-কোলা ক'রে খাট থেকে নামিয়ে বাইরের বারান্দার মেঝের উপরে কম্বল পেতে শোয়ানো হ'ল। সেইখানেই ধীরে ধীরে সব শেষ।

দুই বোন, বড়ো জীবনচণ্ডী ও ছোটো জীবনতারা, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। বাবা চুপ ক'রে বোধ হয় মায়ের মাথা কোলে নিয়ে ব'সে রইলেন। দিদিমা, ঠাকুমা, মাসিরা সকলে কলরব ক'রে কেঁদে উঠলেন। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক গেল। বাবার মামা ভুবন রাঙা দাদা আর পাড়ার দু চারজন শ্মশান-যাত্রার আয়োজন ক'রলেন। খাট আনা হ'ল। "বলো হরি হরি বোল" ধ্বনি শুনে আমাদের মনে কী রকম আতঙ্কের ভাব এল, ছোটো বোন তিন বছরের মেয়ে তারা চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগল—"ও বৌমা, তুমি চ'লে যাচ্ছো, কে আমাকে খাইয়ে দেবে, জামা পরিয়ে দেবে।" ঠিক হ'ল, মুখাগ্নি করবার জন্য বড়ো ছেলে ব'লে দাদা সঙ্গে যাবে, আমায় যেতে বারণ ক'রলে। বাবা গেলেন।

ঠাকুমাই বেরুলেন, তারস্বরে কাঁদতে কাঁদতে একটা ঘটিতে গোবর-জল নিয়ে গোবর-জলের ছড়া দিয়ে তাঁর প্রাণসম প্রিয়, কন্যার চেয়েও বেশি পুত্রবধূর মৃত দেহের অপবিত্র স্পর্শ থেকে বাড়ি ঘর দোয়ারকে মুক্ত করার জন্য মৃত্যুর স্থান থেকে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত এলেন, শোকে অবসাদে ঠাকুমা যেন চ'লতে পারছেন না, পায়ে পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর কাতর কান্নার আওয়াজ এখনও যেন এই ৭৫ বছর পরেও কানে বাজ্‌ছে, "ওরে আমাদের কী হ'ল রে—এই লক্ষ্মীপূজোয় সোনার লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে কোথায় চ'ল্‌ল রে।" রাত্তিরে সকলেই মুহ্যমান হ'য়ে আধঘুম অবস্থায় রইলুম, ভোরের দিকে দিদিমণি (বড়ো বোন) ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন—"ও মা, এতক্ষণে তোমার সোনার দেহ ছাই হ'য়ে গেল মা।"

অশৌচের ক' দিন মোহাবিষ্টের মতো কাটল। দিদিমা, মাসিরা, ছোটো পিসিমা রোজ আস্‌তেন, আমাদের কয় ভাইয়ের হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা ক'র্‌তেন। রাত্রে দশ দিন কেবল ফল আর ছানা খেতে হ'ত। মায়ের বড্ড ভয় ছিল ঋণকে—তিনি নাকি ব'লতেন, টাকা না থাকলে ধার ক'রে শ্রাদ্ধশান্তি করা লোক খাওয়ানোর কোনও দরকার নেই। তিনি ব'লতেন, কারো কাছে হাত পেতে ধার ক'রে খাবো না—যদি চা'লের অভাবে বাড়িতে হাঁড়ি না চড়ে, পড়শীদের জান্‌তে দেবো না—পাতা জ্বেলে খড় কুটো জ্বেলে রান্নাঘরে ধোঁয়া ক'রবো, লোকে জানুক, বাড়িতে রান্না হ'চ্ছে। সামান্য টাকা বাবার হাতে যা ছিল, ঐ

দুই দিনের কালব্যাধিতে সব খরচ হ'য়ে গেল—বাবার হাত খালি। মায়ের মৃত্যুতে যেন একটা সংসার ভাঙ্‌ল, শোকের ব্যাপার, হিন্দুস্থানীতে যাকে বলে "গমী" অর্থাৎ শোকের ছায়া সব কিছু যেন ঢেকে দিয়েছে। যে কয়টি—৮।১০টি আত্মীয় শ্মশানবন্ধু হ'য়েছিলেন, কাঁধ দিয়ে শবদেহ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদেরই আর বারোটি সদ্‌ ব্রাহ্মণকে সামান্য "জলপান" করানোও হ'ল না—অর্থাৎ নিরামিষ লুচি তরকারি দাল চাট্‌নি দই মিষ্টি খাওয়ানো হ'ল না, এঁদের সকলকে "ফলার" করানো হ'ল—অর্থাৎ চিঁড়া দই মুড়কি সন্দেশ ফল খাওয়ানো হ'ল—সঙ্গে চার আনা ক'রে দক্ষিণা। গরিবের বা নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ব্রাহ্মণ-ভোজনে এই রকম ফলার তখনও অপ্রচলিত হয় নি। এইভাবে নমোনমঃ ক'রে মা'য়ের শ্রাদ্ধের সমাপন হ'ল। পরে অবস্থা একটু স্বচ্ছল হওয়ায় দাদা যখন মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধে লুচি তরকারি দই সন্দেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন, তখন এই পুরাতন দুঃখের দিনের কথা মনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে চিঁড়ে মুড়কি দইও খাওয়ানো হ'ত।

মায়ের মৃত্যুর পরে দিদিমা আমাদের ভাইবোনদের কয়েক দিনের জন্য মামার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরে পিসিমা বাবাকে আর আমাদের গড়পার রোডে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাস খানেকের জন্য রাখলেন। একটা বড়ো ঘরে আমরা শুতাম। রাত্রে বহুদিন বাবা কাঁদছেন দেখেছি। সকলে আবার বাড়ি ফিরে এলুম। ৫।৬টি ছেলেমেয়ের সংসার—বাবার আপিস, সকাল সাড়ে আটটার সময় ভাত খেয়ে তাঁকে বেরোতে হয়, তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা, আমাদের দেখাশুনো, এ সব করে কে? বুড়ো ঠাকুমা জরাজীর্ণ, শরীরে তাঁর বয় না, তিনিই কোনও ক্রমে সংসারের ভার টেনে নিয়ে চ'লেছেন। রাঁধুনী বামুন রাখ্‌বার, একজন ঝী বা চাকর রাখবার কথা হ'ল। বাবার মাইনেতে কুলোয় না। দিদিমা পরামর্শ দিলেন, মায়ের ২।৩খানি সোনার গয়না যা ছিল সেগুলি বেচে উপরে দোতলায় দু'খানা পাকা ঘর, আর একতলায় পাকা হলঘর বা দালান করা হ'ল। কাশী জেলায় বাড়ি, মুসলমান মিস্ত্রি গৌসী বা গোসী তার নাম ছিল, সে এই উনিশ শ' তিন কি চার সালে ঘর তিনখানা করে। এমন চমৎকার দরদী খাঁটি মানুষ ছিল এই মুসলমান গৌসী মিস্ত্রি, সে যেন বাড়ির মানুষই হ'য়ে গিয়েছিল, সুখে দুঃখে বরাবরই ছিল যেন নিকট-আত্মীয়—তার বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল। ১৯৩৩ সালে যখন বুড়ো

হ'য়ে গিয়েছে, তাকে ডাকা হ'ল, বালিগঞ্জে হিন্দুস্থান পার্কে আমার নোতুন বাড়ি তৈরি হবে, তার ভিৎ পত্তন তাকে ক'রতে হবে—কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো মানুষ এল, হাতে কর্নিক কাঁপছে—নোতুন ধুতি চাদর প'রে তার কাজ যা করবার তা ক'রলে, আর আমার স্বর্গতা মায়ের কথা ব'লে দু ফোঁটা চোখের জলও ফেললে, তার আল্লার কাছে আমাদের জন্য মোনাজাত ক'রে গেল। মায়ের কথা ভেবে আমারও চোখে জল এল।—যাক্, দোতলার এই ঘর দু'খানা হওয়ায় ঠিক হ'ল, নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া যাক্—নীচের চারখানা ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। তা থেকে কিছুটা সাশ্রয় হবে। তখন একটি আপিসের কেরানি বাবুদের মেসের জন্য জন ছয় সাত কেরানি বাবু ভাড়া নিলেন। নির্বিরোধ সজ্জন ব্যক্তি, শান্তিতে থাকতেন, আমাদের নিয়মমতো ২৫ না ৩০ টাকা ক'রে ভাড়া দিতেন। এঁদের মধ্যে একটি বি-এ ক্লাসের কলেজের ছাত্রও ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে কালিদাসের মেঘদূতের শ্লোক মুখে মুখে ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের শোনাতেন। ইনি ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন, সকলেই অতি সজ্জন, সদালাপী, দরদী ব্যক্তি, এঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি—বিশেষতঃ দুই ভাই ছিলেন চণ্ডীচরণ ঘোষ আর ভবানীচরণ ঘোষ, আর একজন ছিলেন বিধুভূষণ রায়। বহু কাল হ'ল এঁরা গত হ'য়েছেন, কিন্তু এঁদের সৌজন্য ভোলবার নয়।

এইভাবেই চ'ল্‌ল। আমাদের ভাইবোনকে দেখবার জন্য ব্যবস্থা হ'ল, আমার বড়ো পিসিমা—তিনি বহু দিন হ'ল গত হ'য়েছেন, তাঁর এক ছেলে আমাদের ফণী দাদা, যিনি অল্প বয়সেই মারা যান, তাঁর বিধবা স্ত্রী ক'লকাতায় বাপের বাড়িতে থাকতেন, আমাদের এই বৌদিদি আমাদের বাড়িতে এসে থাক্‌বেন। তিনি এসে, ছিলেন-ও মাস দুই—আপন দেওরের, ননদের মতোই আমাদের খুবই যত্ন ক'রতেন। ভালো পরিবারের মেয়ে, তাঁকে আমরা খুবই শ্রদ্ধা ক'রতুম সমীহ ক'রতুম—কিন্তু এই পরিবারের বোঝা তাঁকে দিয়ে বহানো উচিত হয় না—তাঁর নিজের মা আর ভাইদের কাছেই থাকা উচিত—শ্বশুর-বাড়ির প্রতি কর্তব্য মনে ক'রে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন—তাঁর এই উদারতার উপর উৎপীড়ন ঠিক হয় না, তিনি নিজের বাপের বাড়িতেই চ'লে গেলেন। কিন্তু আমাদের বাড়ি, মা না থাকায়, হ'ল লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি। বাড়িতে গৃহলক্ষ্মীর অভাব সবাই অনুভব করে।

এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। এণ্ট্রান্স পাস ক'রলুম [১৯০৭]। দাদা

তখন ইস্কুলেই প’ড়ছে। এদিকে, মায়ের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই, বাবার হিতৈষী আত্মীয় বন্ধুরা কেউ-কেউ বাবাকে উপদেশ দিতে লাগল—তোমার এমন কী বয়স হ’য়েছে, তুমি আবার বিবাহ করো। বাবা শুনতেন, মৃদু মৃদু হাসতেন, আর ব’ল্‌তেন, “হাঁ, দরকার মনে হ’লে ক’রবো বই কি। তবে এখন কিছু কাল যাক্।” এতে আমার দিদিমা একটু বিচলিত হ’য়ে প’ড়লেন। বাড়িতে একটি বৌ থাকা চাই। তাঁরই আগ্রহ আর চেষ্টায়, ইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়া দাদার বিয়ে ঠিক হ’য়ে গেল,—শিবপুরে দিদিমাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মেয়ে দাক্ষায়ণী দেবীর সঙ্গে দাদার বিয়ে হ’য়ে গেল। আমরাও খুশি হ’লুম। আর একটি কুটুম্বিতার সূত্র দিয়ে দিদিমা শিবপুরের সঙ্গে চালতাবাগানের চাটুজ্যে পরিবারকে বাঁধ্‌লেন।

বাবার কাছে কিন্তু মায়ের স্মৃতি মুছে তো যায়-ই নি, বরং আরও উজ্জ্বল হ’য়ে উঠ্‌ছে। মায়ের কথা স্মরণ ক’রে, বিশেষ ক’রে তাঁর শেষ দুদিনের কালব্যাধির সমস্ত খুঁটিনাটি মনে এনে, তিনি গদ্যে পদ্যে মিলিয়ে মায়ের উদ্দেশে একখানি অতি মর্মস্পর্শী স্মরণিকা লেখেন। তাতে আমাদের সংসারের কথাও আছে, আমাদেরও কথা কিছু কিছু আছে, আর মায়ের কথাও আছে। মায়ের প্রতি বাবার মনে কী গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা ছিল, শেষ দুদিনের ব্যাধির কথায় বাবা তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। হৃদয়ের ভাষা, সরল, সহজবোধ্য, আমাদের কাছে তা অমূল্য। এই ক্ষুদ্র বইখানি ছাপিয়ে তিনি আত্মীয় আর মিত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। এঁদের মধ্যে অনেক নামী লোক, সাহিত্যিকও ছিলেন। অনেকেই তাঁদের মনের ভাব—বইখানির সরল অকপট ভাবসম্পুট যে তাঁদের মুগ্ধ ক’রেছে, বিশেষভাবে বিচলিত ক’রেছে, তা তাঁরা জানান। এইরূপ কতকগুলি চিঠিও বাবা পরে বইখানির শেষে পৃথক ভাবে ছাপিয়ে দেন। তার মধ্যে, অগ্রজকল্প নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বরেণ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয় দু’জনের উক্তি বিশেষভাবে মনে প’ড়ছে।*

* এই বইখানি এক খণ্ড আমি অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে দেখেছি, তিনি আমাকে প’ড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বইখানি তিনি আবার ছাপবেন। বর্তমানে এ বইখানি আছে “সুধর্মা” ভবনে সুনীতিকুমারের পুত্র শ্রীসুমনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সহধর্মিণী কমলা দেবীর পরলোকগমনের পরে সুনীতিকুমারও এমনি একখানি বই প্রকাশ করেন—*In Memoriam : Kamala Devi*।

এইভাবে বাবা বন্ধুদের অনুরোধ বা উপদেশ, যে তুমি আবার বিয়ে করো, পালন ক'র্ছেন, ওদিকে তখন ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়ি, আমার এক সহপাঠী আমারই মতো বয়স, ১৬।১৭ বছর, তার মা মারা যান। আমার মা চ'লে যান আমি তখন ১২ বছরের। বন্ধুটির আরও চার পাঁচটি ভাই বোন, তার বাবার বয়স ৪০-এর উপর হবে। ছয় মাস যেতে না যেতেই তিনি আবার বিয়ে ক'রে, আমার বন্ধুটি আর তার ভাইবোনদের জন্য প্রায় বন্ধুটিরই বয়সের নোতুন মা নিয়ে এলেন। শুনে, আমাদের মন পিতৃগর্বে ফুলে উঠ্‌ল—এই আমাদের বাবা, মায়ের সম্বন্ধে এক-নিষ্ঠ। আমরা যখন আমাদের বেশি বয়সেও—যখন আমরা ৫০-এর কাছাকাছি—মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ক'রতে ব'সতুম, বাবা সেখানে থাকলে তাঁর চোখে জল দেখ্‌তুম। সাধ্বী ভাগ্যবতী মা আমার, আমাদের জন্যও তুমি কী ক'রে গিয়েছ তা ভেবেও কোটি কোটি প্রণাম তোমার উদ্দেশে নিবেদন করি, তাতেও যেন তৃপ্তি হয় না।

মানুষের জীবনের পিছনে তার পূর্বে আর তার অবসানে কী আছে কিছুই জানি না—মানুষের পক্ষে এই জীবনে তা জানাও সম্ভব নয়। অজ্ঞেয়-বাদী আমি, নাস্তিক নই।—একটা বিরাট্ সত্তার মধ্যে আমরা সকলেই সব কিছু নিয়ে আছি, এইরকম একটা বোধ মনের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু মা বাবা ঠাকুদা ঠাকুমার স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যে একটা বড়ো জিনিস। এই জন্যই Balzac-এর "নাস্তিকের পূজা" গল্পের মতন, আমি তাঁদের কথা ভেবে বছরের মধ্যে চোদ্দদিন পিতৃপক্ষে তাঁদের তর্পণটা ক'রে আস্‌ছি—তাঁরা আছেন কি নেই, থাকলে পরে কোথায় কিভাবে আছেন তা জানি না। এই তর্পণের জলে (আর শ্রাদ্ধের যবের ছাতুর বা ভাতের পিণ্ডিতে) তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ হবে (আর ক্ষুধার শান্তি হবে), এই বিশ্বাস বা কল্পনা আমার নেই। কিন্তু তর্পণ করি, শ্রাদ্ধের দিন তাঁদের কথা একটু ভাবি, তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করি, এইটাই আমার পক্ষে মস্ত বড়ো লাভ, এই তর্পণের সময়ে তাঁদের কথা ভেবে তাঁদের প্রণাম ক'রে চোখ জলে ভ'রে যায়, তাঁদের যেন প্রত্যক্ষ দেখি। এই-ভাবে তাঁদের সঙ্গে বছরে একটা সময়ে যোগ কল্পনা করা—এ থেকে যেটুকু আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, তা থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করি ?

এইভাবে বাল্যকাল কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ইস্কুলের পড়া ভালোই চ'লছে, YMCA Boys' Branch-এর লাইব্রেরি থেকে রুচি মতন নানা রকম বই পড়া যাচ্ছে, আর ছবি দেখা আর ছবি আঁকার আনন্দের উপলব্ধি নোতুন ভাবে হ'য়েছে।

জীবনে তিনটি বড়ো জিনিসের সঙ্গে সংস্পর্শ আর পরিচয় ঘটবার পরম সৌভাগ্য আমার হ'ল—(১) বিবেকানন্দের লেখা আর তাঁর বেদান্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে, (২) রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে, আর (৩) অবনীন্দ্রনাথের, আর রাজ-পুত মোগল আর কাংড়া শৈলীর চিত্রকলার সঙ্গে। তার কিছু পরে, কলেজে পড়বার সময়ে, গ্রীক ইতিহাস পাঠ্য থাকায়, গ্রীক শিল্পের সঙ্গে একটু পরিচয় ক'রে নেবার সৌভাগ্য হয়। প্রথমটির জন্য আমি ঋণী বন্ধুবর প্রভাতকুমার বর্ধনের কাছে, দ্বিতীয়টির জন্য সহপাঠী সুহৃদ্ গোরার (গৌরগোবিন্দ গুপ্তর) কাছে, আর তৃতীয়টি নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চোখের কাছে ধরা দেয় যেদিন YMCA Boys' Branch-এর ছেলেদের নিয়ে সেক্রেটারি Arthur Lefevre সাহেব আমাদের ক'লকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের ছবির গ্যালারি দেখিয়ে আনেন—তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, ইংরিজি ১৯০৩ সাল হবে। এই তিনটিকে আশ্রয় ক'রে (আর পরে গ্রীক ভাস্কর্য্য ও অন্য কলা দেখে*), আমার জীবনে সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার সাধনার বোধ হয় সব-চেয়ে বড়ো পথ যেন আমার জন্য খুলে গেল। পড়াশুনো ক'রে যাচ্ছিলুম, এমনি গতানুগতিকভাবে। খুব বেশি "আঠা" বা আকর্ষণ ছিল না, পড়াশুনোর প্রতি ; ইস্কুল-পাঠ্য বই সম্বন্ধে মোটেই বই-মুয়ো বা বই-মুখো ছিলুম না। যে রকম যেন প্রাণপাত ক'রে, "আদা-জল খেয়ে" আমার দুই-একজন গুরুস্থানীয় দাদাদের

* প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময়ে ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপক গ্রীক-প্রেমিক কবি মনোমোহন ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য শিল্পের প্রতি সুনীতিকুমারের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, এই সশ্রদ্ধ অনুরাগ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের প্রতি সুনীতিকুমার তাঁর কৃতজ্ঞতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রেছেন (দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', *Professor Manmohan Ghose*)।—অ।

আর ইস্কুলের অন্ত ছাত্রদের প'ড়তে দেখতুম, সেটাতে আমার মন কিছুতে সায় দিত না। রাত জেগে "চোখে সরষের তেল দিয়ে", বা মাথায় টিকি থাকলে টিকিতে দড়ি বেঁধে দেয়ালে উঁচুতে গাঁথা পেরেকে সেই দড়ি আটকে যারা প'ড়ত, তাদের কথা তুলে ঠাট্টা ক'র্‌তুম। চোখে সরষের তেল দেওয়া মানে রাত্রে চোখ জ্বালা ক'রবে, ঘুম হবে না; আর দেয়ালের গায়ের পেরেকে টিকি বাঁধা থাক্‌লে প'ড়তে প'ড়তে ঘুমে ঢ'লে প'ড়লে মাথা ঢুলে যাবে, দড়ির ঝাঁকানিতে অমনি ঘুমের চট্‌কা ভেঙে যাবে। সারা বছর বাজে বই প'ড়ে সময় নষ্ট করে, পরীক্ষার মাসখানেক আগে একঠেসে পাঠ্য পুস্তকগুলো প'ড়ে ফেল্‌তুম, তাতেই পরীক্ষায় ভালো ক'রতুম। কিন্তু ভালো ফল ক'রবার যত্ন আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ ছিল না। শরীরটা ভালো ছিল, এক চোখ ছাড়া। একটু গুণ্ডা প্রকৃতির ছিলুম, সহপাঠীদের সঙ্গে ধাক্‌কাধুক্‌কি ক'রতুম খুব। ইস্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে আমিও যে একজন "ভালো ছেলের দলে" পৌঁছে গিয়েছি, সে খেয়াল ছিল না। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যে ভালো ফল ক'রতে হবে আমায়, সে আগ্রহও ভিতর থেকে ছিল না। তবু মাষ্টার মশায়দের চেষ্টা ছিল, তাঁদের আশা ছিল যে আমি ভালোভাবে পাস ক'রে তাঁদের মুখ রক্ষা ক'রবো। তখন যেন মনে মনে একটু বিব্রত হ'য়ে প'ড়তুম। আমরা যে বছর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, সে বছরের সব-চেয়ে ভালো ছেলে ছিল দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্জে, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়। সে আর কালীধন চাটুজ্জে প্রভৃতি কতকগুলি, হেয়ার হিন্দু মিত্র ইন্‌ষ্টিট্যুশন প্রভৃতি কতকগুলি নামী ইস্কুলের, ভালো ছেলে পরীক্ষার পর গোলদীঘীতে অনেক দিন বিকালে বেড়াতে আস্‌ত, আমিও যেমন আস্‌তুম—পরীক্ষার ফল বেরোবার পূর্বে সকলে মিলে গোলদীঘীতে জল্পনা-কল্পনা ক'রতুম, কে কেমন লিখেছে, কী রকম ফল আশা করে। আমিও যোগ দিতুম, শুন্‌তুম, ভাব্‌তুম, আমিও কি পরীক্ষায় এদের মতন ভালোভাবে উতরাবার আশা ক'রতে পারি? পরে যখন ফল বা'র হ'ল, আমার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমি প্রথম দশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান পেয়ে আর ২০ টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়ে ইস্কুল-জীবন সমাধা ক'রলুম। আমার মনে কিন্তু পরীক্ষার এই ভালো ফল হওয়ায় আনন্দ হ'য়েছিল, বাবা ঠাকুমা এঁদের আর ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদের আনন্দ দেখে। ঠাকুদ্দা তার আগেই গত হ'য়েছেন। আত্মীয় হিতৈষীরা সকলেই ব'ললেন, "এ ছেলে নিশ্চয়ই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হবে—যদি আইনের দিকে যায়, তা হ'লে হয়তো

হাইকোর্টের জজও হ'তে পারবে।" তখনকার দিনে ইংরেজের অধীন বাঙালী কেরানির ছেলের পক্ষে এর চেয়ে বেশি আর কী হওয়ার কথা ভাবা যায়? আমার মনে কিন্তু হ'ল, ভালো কলেজে এইবার প'ড়বো, যেখানে লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে—মনের সুখে প'ড়বো। ইতিহাস, সংস্কৃত প'ড়বো, অন্য ভাষা শিখবো। আর সব-চেয়ে ভালো হ'ল, মাসে যে ২০ টাকা ক'রে স্কলারশিপ বা ছাত্রবৃত্তি পাবো, তাতে, বাবার কম মাইনের সংসার আমাদের, বাড়ির কিছু সাশ্রয় হ'বে, আমাকে কলেজে পড়াবার জন্য বাবাকে খরচের জন্য চিন্তা ক'রতে হবে না। সে সময়ে কলেজে ভর্তি হওয়া সহজ ছিল, যে পরীক্ষায় ভালো ক'রেছে, সে অক্লেশেই নানা সুযোগ পেত। আমাদের সুকিয়াস্ স্ট্রীটের বাড়ির খুব কাছেই হেদুয়া পুখুরের (কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের, বা আজাদ হিন্দ বাগের) সামনেই General Assembly's Institution জেনেরাল অ্যাসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌স্টিট্যুশন ব'লে স্কটলাণ্ডের মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বেশ নামী কলেজ ছিল। পরে স্কচ মিশনারিদের আর একটি কলেজ Duff College, যেটি নিমতলা ঘাটের কাছে ছিল (পরে এই বাড়িটিতে এক সরকারি আদালত স্থাপিত হয়), আমাদের কলেজের সঙ্গে মিলে যায়, আমরা থাকতে থাকতেই এই দুই মিলিত কলেজের নাম হয় Scottish Churches College—তখন স্কটলাণ্ডের ধর্ম-সংস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, সে দুটি পরে আবার মিলে এক হ'য়ে যায়, ক'লকাতায় তখন কলেজের নাম হয় Scottish Church College. সেখানে গিয়ে, আমার পরীক্ষার ফল বা'র হ'য়েছে, প্রথম বিভাগে পাস ক'রেছি, কিন্তু তখনও যে ষষ্ঠ হ'য়ে ২০ টাকার বৃত্তি পেয়েছি এ খবর বা'র হয় নি—আমি দরখাস্ত দিই, আমি প্রথম বিভাগে পাস ক'রে First Arts ক্লাসে ভর্তি হ'তে চাই, আমার মাইনে কিছু কম ক'রে দেওয়া হোক্, এই আমার প্রার্থনা। সঙ্গে-সঙ্গেই তা মঞ্জুর হয়, হাফ-ফ্রী হ'য়ে ভর্তি হই। পরে, কয় সপ্তাহ পরে যখন স্কলারশিপের খবর বেরুল, তখন প্রিন্সিপাল Lamb সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রতেই পুরো অবৈতনিক ছাত্র আমায় ক'রে দেওয়া হ'ল।

জ্যোতি ক'মেছে, বোধ হয় উত্তরোত্তর আরও ক'মে যাচ্ছে—ছানি প'ড়ছে—বিশ বছর ধ'রে প্রায় তাতে ডাক্তার পূর্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর দেওয়া eye-drops রাত্রে লাগিয়ে আসছি, তাতে সুশীল দে'র* উপকার হ'য়েছিল, সুশীলবাবুর কথায় পূর্ণেন্দুবাবুর চিকিৎসা গ্রহণ করি—উঠ্‌তি ছানি (হিন্দীতে বলে "মোতিয়া বিন্দ্"—সংস্কৃতে "তিমির-রোগ") আর প্রসার লাভ ক'রতে পারে নি—চোখের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। এখন নূতন উপসর্গ—খুব ছোটো অক্ষরও খালি চোখে প'ড়তে পারি, কিন্তু সব যে ঝাপসা হ'য়ে আস্‌ছে। বেশিক্ষণ পড়তে পারি না, যদিও লিখে যেতে তেমন কষ্ট হয় না, হাত আন্দাজি আন্দাজি বেশ চলে—কিন্তু সব বিষয়ে এই স্বচ্ছন্দ পাঠের শক্তির অভাবে আর কিছু ভালো লাগে না, চেষ্টা ক'রেও স্থির লেখা পড়ার কাজে মন বসাতে পারা যাচ্ছে না। তবুও আব্‌ছা আব্‌ছা যা পারি পড়াশুনা, উপর-উপর ক'রে আস্‌ছি, নোতুন বই লাইব্রেরি থেকে নিচ্ছি, কিন্‌ছিও—যে Sacred Books of the East-এর ১২ খণ্ড†, গ্রীক লেখকদের ভারতবর্ণন‡ প্রায় ৩৫০ টাকার বই কিন্‌লুম, সেগুলি নিয়ে নাড়াচাড়াও ক'রছি, ছবি সংগ্রহও চ'লেছে—কবে যে, ডাক আসবে জানি না, তবে মনে প্রাণে চোখের এই অবস্থায় তার কামনা ক'রছি, এদিকে Indology, Vedic Studies, রবীন্দ্র-সাহিত্য, অন্য আলোচনা নিয়ে আনন্দ, ছবি দেখাও চ'লেছে, বৈদিক-হিন্দু "শ্রাদ্ধপদ্ধতি"[১১], রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" নিয়ে বই লেখার কথাও ভাবছি—রামায়ণ-কথা নিয়ে লেখাটা কবে পূরো ক'রতে পারবো সে চিন্তাও আছে[১৩]—নোতুন কত

* স্বনামধন্য পণ্ডিত অধ্যাপক সুশীলকুমার দে সুনীতিকুমারের চেয়ে বয়সে কয়েক মাসের বড়ো ছিলেন, দু' শ্রেণী উপরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প'ড়তেন। সুশীলকুমার আর সুনীতিকুমার, উভয়েই ইংরিজিতে এম-এ, উভয়েই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট—সুশীলকুমার সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে আর সুনীতিকুমার ভারতীয়-আর্য্য ভাষাতত্ত্বে।

† বিদেশে প্রকাশিত মূল সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ (ফোটোষ্টাট). প্রকাশক মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লী।—অ।

‡ *Classical Accounts of India*, Ed. by R. C. Majumdar. Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta-12, 1960.—অ।

গবেষণা হচ্ছে, লোকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে একটু ক্ষোভও হয়—কিন্তু উপায় তো নেই। চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের কথা সব সময়েই মনকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে রেখেছে—ডকটর পূর্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে, অধ্যাপক সুরেশ সেনগুপ্তের ভাই ডকটর মুরলীধর সেনগুপ্তকে, ডকটর অমল সেনকে দেখালুম। ডকটর ইন্দ্রশেখর রায়ও দেখ্‌লেন, তিনি আশ্বাস দিলেন ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৭৭-এ) ছানি কাটতে পারেন বাঁ চোখের—পূর্ণেন্দুবাবুর পরামর্শ মতো Barcelona—Spain-এ তার জন্য ডকটর Baraquerre-এর শরণাপন্ন হ'তে হবে না। কী হবে জানি না—বাদলের* কাজের ফাঁকে সময় হ'লেই তবে ব্যবস্থা হবে।

জেনেরাল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিট্যুশনে বেশ পড়াশুনো হ'চ্ছিল। কতকগুলি সহপাঠী বন্ধু পেলুম—সারা জীবন প্রায় এদের সঙ্গে কাট্‌ল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বরিশাল ব্রজমোহন কলেজিয়েট ইস্কুল থেকে পাস ক'রে আসেন—পরে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন, প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে পড়ি, তিনি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী হন—শেষে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকর্মণ্য হ'য়ে বহু বৎসর শয্যাশায়ী ছিলেন। অনেক কষ্ট পেয়ে অত বড়ো একজন পণ্ডিত সজ্জন অকালে দেহরক্ষা করেন [১৯৫৭ খ্রীঃ অঃ]। প্রমথনাথ মিত্র বোধ হয়, East Bengal and Assam ব'লে লর্ড কার্জনের দ্বারায় বঙ্গভঙ্গের পরে যে নূতন প্রদেশ হয়, সেখানকার এণ্ট্রান্স পাস ছেলেদের মধ্যে প্রথম হ'য়ে আসেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা একসঙ্গে ইংরিজিতে বি-এ অনর্স্‌ ও এম-এ পড়ি, পরে প্রমথ আইন-ব্যবসায় গ্রহণ করেন, হাইকোর্টের জজও হন, এখন অবসর গ্রহণ ক'রে আমার মতন বৃদ্ধ বয়সে জোরের সঙ্গে ওকালতি চালাচ্ছেন। ইস্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে ২।৩ জন এই একই কলেজেও আমার সহপাঠী থাকেন, তার মধ্যে গোরা (গৌরগোবিন্দ গুপ্ত) অন্যতম—গোরার কথা আগে ব'লেছি, দর্শনে এম-এ পাস ক'রে পরে বহু দিন ধ'রে কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক হ'য়ে ছিল। ক্লাসভরা ছাত্রদের সকলের সঙ্গেই আমার বেশ মেলামেশা ছিল। আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, ভোলানাথ চক্রবর্তী—এরা পরে আমার মতো অধ্যাপক হয়। শচীন্দ্রনাথ বসু—মধ্য-প্রদেশে Gadarwara-তে আর রায়পুরে ওকালতি করে। সকলের নাম এখন আর মনে আসছে না, কিন্তু

* সুনীতিকুমারের একমাত্র পুত্র শ্রীসুমনকুমারের ডাক-নাম 'বাদল'।—অ।

অনেকের চেহারা, তাদের নিয়ে ছোটোখাটো ঘটনা সব ভুলি নি, এখনও চোখের সামনে যেন জল্ জল্ ক'রছে। আমাদের এক ক্লাস উপরে ছিল শিশির ভাদুড়ী। আমাদের দু বছর আগে সে এণ্ট্রান্স পাস করে, কিন্তু ইংরিজিতে এম-এ পরীক্ষা দেয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই, ১৯১৩ সালে—শিশিরের কথা কিছু কিছু অন্যত্র লিখেছি*—এক কথায়, তাঁকে আমাদের যুগে সব-চেয়ে ধীশক্তিসম্পন্ন উদারহৃদয় ছাত্র বলা যায়—the most brilliant student of his time—সাহিত্যে নাট্যশিল্পে তাঁর কৃতিত্ব বাঙ্গালীর আর ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু—রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়ে, শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব পেয়ে সে ধন্য হ'য়েছিল।

স্কটলাণ্ডের Presbyterian সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানরা ইংলণ্ডের Church of England সম্প্রদায়কে মানতেন না—তাঁদের খ্রীষ্টধর্ম ব্যাখ্যা একটু অন্য ধরনের। যদিও এই দুই-ই Roman Catholic সম্প্রদায়ের বাইরে, এবং বিপক্ষে। আবার স্কটলাণ্ডে যে Presbyterian Church, বা Church of Scotland ছিল তার মধ্যেও ভাঙ্গন ধ'রে দুটি দল হয়। ক'লকাতায় শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় তরুণদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রীষ্টান [সম্প্রদায়] নানা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলে—যেমন রোমান কাথলিকদের St. Xavier's College, Church of England-এর নানা বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান, নরওয়ে ও সুইডেন-এর Lutheran Mission, তেমনি ক'লকাতায় স্কটলাণ্ডের Presbyterian Church-এর দুটি দল আলাদা আলাদা দুই কলেজ চালাচ্ছিলেন—Duff College আর General Assembly's Institution. পরে এই দুই দলের নেতারা ঠিক করেন ক'লকাতায় ব্যয়সাধ্য আলাদা দুটো কলেজ আর না রেখে দুটো কলেজকে মিলিয়ে এক কলেজ করা হবে। আমরা তখন General Assembly's Institution-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—হেদুয়া পুখুরের পূবে আমাদের কলেজের বাড়ি, আর Duff College চ'লত নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে এক বিরাট বাড়িতে। দুই কলেজ মিলিয়ে নূতন কলেজ হ'ল—Scottish Churches College—তখনও ধর্মমতে দুইয়ের মিল হ'য় নি ব'লে Churches—বহু-বচনে। Duff College-এর শিক্ষকরা, ছাত্রেরা হেদুয়ার বাড়িতে এল। বিলাত থেকে পুরাতন প্রিন্সিপাল Dr. A. B. Wann এই যোড় কলেজ

কায়েমী করবার জন্ম এলেন—আমরা Scottish Churches College-এর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে Dr. A. B. Wann-এর ছাত্র হ'লুম। Duff College-এর পুরানো বাড়ি সরকার থেকে এক আদালতে রূপান্তরিত করা হ'ল।

এই ভাবে Scottish Churches College তার নোতুন এক গৌরবময় যুগে প্রবেশ ক'রলে। আগে General Assembly's Institution-এ যেমন Dr Hastie প্রমুখ বড়ো বড়ো অধ্যাপক ছিলেন, এখন Scottish Churches College-এ Dr. Wann-এর পরে বড়ো বড়ো অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ এলেন—Dr. Urquhart, Dr. Stephen, Mr. Scrimgeour, Mr. Tomory, Mr. Cameron.[১৩] ক'লকাতায় Presidency College আর St Xavier's College-এর সঙ্গে এক পর্য্যায়ের হ'য়ে উঠ্‌ল Scottish Churches College. কিছু পরে, Presbyterian Church-এর মধ্যে যে খ্রীষ্টান শাস্ত্রীয় ব্যাপারে মতভেদ ছিল সেটা যখন মিটে গেল, তখন আর দুই Church র'ইল না, কলেজের নামও হ'য়ে গেল Scottish Church College.

Scottish Churches College-এ Duff College-এরও ভালো ভালো অধ্যাপক আর ছাত্ররা যোগ দিলেন। আমাদের সময়ে আমরা প'ড়েছিলুম Dr. Wann, Mr. D. Evelyn Evans, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বরুণচন্দ্র দত্ত (রসায়ন), অধ্যাপক মন্মথনাথ বসু (বাঙলা), অধ্যাপক বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ[১৪] (সংস্কৃত)—এঁদের কাছে। গৌরীশঙ্কর দে তখন ছিলেন বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক।*

টীকা

১। পৃঃ ১॥ দ্রষ্টব্য 'নবজাতক'-এর "কেন" কবিতা। সুনীতিকুমারের প্রিয় রবীন্দ্র-কবিতাবলীর মধ্যে এইটি ছিল অন্যতম। বিশেষভাবে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি থেকে সুনীতিকুমার এই কবিতাটির কথা প্রায়ই ব'লতেন। নিজে বার বার প'ড়ে, অন্যের মুখে বার বার শুনেও যেন তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। যাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সাক্ষাতে, এমন কি ফোনে ডেকেও, তাঁদের ব'লতেন এই কবিতাটি নোতুন ক'রে প'ড়তে। প'ড়তে প'ড়তে কবিতাটির কতগুলি পংক্তি তাঁর মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে—"নিরর্থক হরণে ভরণে / মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা / মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা / বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন,—/ কিন্তু কেন।"—এই কয়টি পংক্তি তিনি মাঝে-মাঝেই আপন মনে আবৃত্তি ক'রতেন।

শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত "যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ"-শীর্ষক প্রবন্ধে সুনীতিকুমার এই প্রসঙ্গে বলেন : "···উত্তরকালে, ভাব- ও কর্ম-জগতে নিজের কৈশোর ও যৌবনের মুখ্য প্রেরণা বিচার করিয়া দেখি, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উঁহাদের দুইজনের রচনা ও ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর হইয়াছে।···এই দুই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা ও আশীর্বাদ আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে, ধন্য করিয়াছে,—আমার কাছে আত্ম-চেতনা আনিয়া দিয়াছে, অপূর্ব চিত্ত-প্রসাদ আনিয়া দিয়াছে।" ('মনীষী স্মরণে', জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, ১৯৭২, পৃঃ ১২৩)। তবে, তাঁর পরিণত জীবনে, বিশেষভাবে জীবনের পরিপূর্ণতার পর্বে, রবীন্দ্রনাথ-ই সুনীতিকুমারের ভাবলোকে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো বিরাজ ক'রেছেন। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে সুনীতিকুমারের সংকলিত *A Shortened Arya Hindu Vedic Wedding and Initiation Ritual* পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশ ('সংক্ষিপ্ত আর্য হিন্দু বৈদিক উপনয়ন-পদ্ধতি') রবীন্দ্রনাথের "পুণ্য স্মৃতি"-র উদ্দেশে উৎসর্গ করেন "তৎপাদানুধ্যাত সদাপ্রণত সুনীতিকুমার।" ঐ বছরই ২৯ ডিসেম্বর

অধ্যাপক শ্রীজয়লাল কৌল-কে তিনি একখানি চিঠিতে লেখেন : I am not an atheist, but I am an agnostic with imagination—being a follower of Rabindranath Tagore. রবীন্দ্রনাথ agnostic ছিলেন কি না সে-বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু সুনীতিকুমার যে তাঁর সুদীর্ঘজীবনব্যাপী আত্মসমীক্ষার শেষে নিজেকে a follower of Rabindranath Tagore ব'লেই জেনেছিলেন, সে-বিষয়ে তিনি মতদ্বৈধের অবকাশ রাখেন নি। "শিল্প ও জ্ঞান দীর্ঘকালপ্রসারী", কিন্তু "জীবন ক্ষণিকের—তাহা হইলেও এই ক্ষণিকের জীবনের জন্য" সুনীতিকুমারের কোনও ক্ষোভ ছিল না, "তাহার মুখ্য কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিরাট শিল্পময় প্রতিভার, দর্শনময় ব্যক্তিত্বের তাঁহার মতো সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাণীর ও জীবনের স্পর্শ—এবং আশীর্বাদও আমি আমার জীবনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়া গেলাম।"*

৩। পৃঃ ৭॥ দ্রষ্টব্য 'পরিশিষ্ট', "আমার ছেলেবেলার কথা"। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার তাঁর "যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ" প্রবন্ধটিতে আরও লিখেছেন : "...চতুর্থ শ্রেণীতে সহপাঠী রূপে পাইলাম বন্ধুবর প্রভাতকুমার বর্ধনকে [মৃত্যু ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯]। ...ইস্কুলে এক-ই ক্লাসে চারি বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে আমরা পাঠ করি। পরে প্রভাত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, আমি স্কটিশ চার্চেস কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ, বি-এ ও এম-এ পড়ি।...প্রভাতের পিতৃদেব চণ্ডীচরণ বর্ধন মহাশয় কলিকাতা বহুবাজারে সার্পেণ্টাইন লেনে উঁহাদের বাসভবনে Hindu Boys' School নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় চালাইতেন—...প্রভাতের সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহার পিতৃদেবের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রভাতের পিতৃদেব ছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইস্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি ছোটো গ্রন্থালয় তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজীর ইংরেজি ও বাঙ্গালা বই, লেখা ও বক্তৃতাদির সংগ্রহ ছিল, পরমহংসদেব সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি বই ছিল।...এই গ্রন্থালয় হইতে অনেকগুলি বই আমি প্রভাতের পিতার অনুগ্রহে বাড়িতে লইয়া গিয়া পাঠ করিতে পারি।... স্বামীজীর বাঙ্গালা ও ইংরেজি পুস্তক—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'চিকাগো বক্তৃতা', 'My Master', 'From Colombo to Almora',

* দ্রষ্টব্য এই বইয়ের শেষে 'সংযোজন' অংশে "রবীন্দ্র-জীবনদেবতা"।

প্রভৃতি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ পাই। প্রভাতের উৎসাহে ইস্কুলে, আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জনকয়েককে লইয়া আমরা একটি পাঠচক্র গঠন করিয়াছিলাম। সেখানে আমরা টিফিনের ছুটির সময়ে আধ ঘণ্টা বিশ মিনিট ধরিয়া কোনও ইংরেজি বই পড়িতাম বা বই লইয়া আলোচনা করিতাম—একজনের পাঠফল আর পাঁচজনেও উপভোগ করিতাম। প্রভাত এই পাঠচক্রে আমাদের কাছে From Colombo to Almora, Chicago Address প্রভৃতি চেঁচাইয়া পাঠ করিত, আমরা শুনিতাম।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ১২০-২১)।

৪। পৃঃ ১০ ॥ সুনীতিকুমার 'যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার···সহপাঠী শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্তের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বা গোরা শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিল, সেখান হইতে সে মোতী শীলের ইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হয়। তাহার কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্য-চর্চার আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। পরবর্তী কালে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, রবীন্দ্রনাথকে সভা-সমিতিতে দূর হইতে দেখিবার এবং তাঁহার ভাষণ শুনিবার সুযোগ ঘটে, এবং বি-এ পাস করিবার কিছু পরে, সম্ভবতঃ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, শান্তিনিকেতনে গিয়া প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের স্নেহলাভে সমর্থ হই, এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আমার জীবনের অন্যতম প্রধান সার্থকতা আমি লাভ করি।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ১২২-২৩)। সুনীতিকুমার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করেন। এর কিছু পরে, এম-এ পড়বার সময়ে, তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎ পরিচয় প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার তাঁর একটি ইংরিজি প্রবন্ধে (*Rabindranath Tagore : What I received from him—what he gave to India—how he served humanity*) লিখেছেন : ···I had never any occasion to exchange any word with him [Rabindranath] before, I believe, the year 1911. At that time I was a student of the M. A. class, preparing for my M. A Degree Examination in English Language and Literature, with a lot of Old and Middle English and Germanic

Linguistics as my special subject. This linguistic study of English was preparing my mind for a study of the history of my own mother-tongue, Bengali, and of the sister Aryan languages of India. I was eager to get guidance in this matter wherever I could receive it from. Naturally, whatever was written in Bengali and in English I read, as and when I could lay my hands on it, and I discovered that Rabindranath himself, in some of his remarkable essays, had made some very pertinent suggestions about the nature of the Bengali language in some of its salient characteristics. ...Rabindranath at that time was running his school of Santiniketan at Bolpur, where his father Maharshi Devendranath Tagore founded an *Āśrama* or retreat...When I went to Santinikaten I went with recommendations from some friends, including one from Sri Gaur Govinda Gupta··· I was given a very cordial reception....I have not kept any record of my first interview with Rabindranath, but I have a vague idea that I broached before him my interest in Linguistics, and I wondered how he was himself interested in the subject. Later on, I found from the library of the school that Rabindranath had read carefully, with occasional notes and markings in pencil in his own hand, the English translation in four [?] volumes of Karl Brugmann's Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages. This was, of course, a very heavy book to read, but it showed Rabindranath's single-minded devotion to scholarship and the pains he took to know in detail about things which interested him. (সুনীতিকুমারের এই ইংরিজি রচনাটি অদ্যাবধি কোথাও প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু এর রূপ অনুবাদ প্রচারিত হয় ১৯৬১ সালে

মস্কো থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক সংকলন-গ্রন্থে—*Rabindranat Tagor* :

৫। পৃঃ ১৩॥ সুনীতিকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (দেশ, ৭ ১৩৫৬) লিখেছেন : "ইস্কুলে পড়্বার সময়ে ১৪ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে—'চিত্রা'র আর 'কথা ও কাহিনী'র কতকগুলি কবিতার মাধ্যমে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার একটি ঝলক চোখের সামনে আসে—অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্য্যময় স্বপ্নরাজ্যের দ্বার যেন আমার জন্যে উন্মুক্ত হ'য়ে যায়। যার পাত্র যতটুকু, সে ততটুকু-ই নিতে পারে—আমার মতো সাহিত্যিক-রসবোধ-বর্জিত নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচকের মন যতটা আপ্লুত হবার তা হ'য়েছে, জীবনে এক নোতুন অমৃত রসের আস্বাদ রবীন্দ্র-রচনা আমার কাছে এনে দিয়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচক হিসাবে আমার পক্ষে একটা বিশেষ আত্মপ্রসাদের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক আমাদেরই পর্য্যায়ে পড়ে—ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আলোচ্য বিদ্যার একজন পথিকৃৎ ব'লে আমরা মেনে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য, সেটা জীবনে এক অপূর্ব সৌভাগ্য রূপে আমি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াটাই ছিল এক শ্রেষ্ঠ মানসিক রসায়ন। তাঁর স্নেহ পেয়েও ধন্য হ'য়েছি।...তানসেন তাঁর এক ধ্রুপদের বাণীতে তাঁর আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে ব'লেছেন যে, তুমি বহুবল্লভ, কিন্তু তানসেনের কাছে তুমি একবল্লভ। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি এমন একটা দিক পেয়েছি, যেখানে কেবল তিনি আছেন আর আমি আছি—আর কারো স্থান সেখানে নেই। একথা আমার মতো আরও অনেকে নিশ্চয়ই ব'ল্তে পারবেন। মহাপুরুষের সর্বন্ধরত্বের এই একটা প্রমাণ।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ৭২-৭৩)।

৬। পৃঃ ২৫॥ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম পুস্তকের 'চতুর্থ আপত্তি'-শীর্ষক অধ্যায়ে প্রথমে হুগলী জেলার "কতকগুলি বর্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান ও বিবাহ-সংখ্যার পরিচয়" দিয়েছেন। এই তালিকায় প্রথম নাম "ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়", তাঁর বিয়ের সংখ্যা "৮০", বয়স "৫৫", বাসস্থান "বসো", আর শেষ নাম "মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়", তাঁর বিয়ের সংখ্যা "৫", বয়স "১৮",

বাসস্থান "দণ্ডিপুর"। তালিকাটি দিয়ে লিখেছেন: "অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক; বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাঁহাদের নাম নির্দিষ্ট হইল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না।" হুগলী জেলার বহুবিবাহকারীদের তালিকা দিয়ে, বিদ্যাসাগর মহাশয় "কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত" "প্রসিদ্ধ জনাই" "গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের" তালিকা দিয়েছেন। জনাই গ্রামের তালিকাতে প্রথম নাম "মহানন্দ মুখোপাধ্যায়", তাঁর বিয়ের সংখ্যা "১০", বয়স "৩৫", আর শেষ নাম "যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়", বিয়ের সংখ্যা "২", বয়স "২০"।

৭। পৃঃ ৩২॥ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও কাত্যায়নী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুনীতিকুমারের সহিত বিহার প্রদেশের গয়া জেলার বৈতর গ্রামের বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বনলতা দেবীর প্রথম সন্তান কমলা দেবীর (জন্ম জানুয়ারি ১৯০০) বিবাহ হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল তারিখে। সুনীতিকুমার তাঁর বিবাহে বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোকে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত সেই শ্লোকটি হ'চ্ছে—

স্বস্তি স্বীয়ে পরিণয়বিধাবুৎসবং সংবিধাতুং
সম্পূর্ণাঙ্গং সকলসুহৃদাং স্বাগতৈঃ প্রেমধাম্নাম্।
প্রীতিস্নিগ্ধাং প্রমুদিতমনা যচ্ছতীমাং লিপিং তে
জায়াং নামানুকৃতকমলাম্ আপ্তুকামঃ সুনীতিঃ॥

সংস্কৃতে নানা ছন্দে শ্লোক রচনা করা সুনীতিকুমারের একটি প্রিয় ব্যসন ছিল বলা চলে। নানা উপলক্ষ্যে নানা প্রসঙ্গে তিনি প্রায় ৩০০ সংস্কৃত শ্লোক রচনা ক'রেছেন; কয়েকটি বাদে এগুলি প্রকাশিতও হ'য়েছে।

৮। পৃঃ ৩৭ পাদটীকা* ॥ 'যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার লিখেছেন : "আমার পিতৃদেব স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৪৫) স্বামীজীর কৈশোরে ও তাঁহার প্রথম যৌবনে তাঁহাকে জানিতেন। আমাদের তিন পুরুষের পৈতৃক ভিটা সুকিয়াস্ স্ট্রীট (নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় গলি, অধুনা সুকিয়াস্ রো)—বাহির সিমুলিয়া চালতা-বাগান পল্লীতে স্থিত, স্বামীজীর পৈতৃক ভিটা গৌরমোহন মুখুজ্যে স্ট্রীটের বাড়ির খুব কাছেই। প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক বিধায় ছেলেবেলায় আমার পিতা ও স্বামীজী ও অন্যান্য কতকগুলি সঙ্গী বিকালে হেদুয়া পুখুরের পাড়ে (কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে) মিলিত হইতেন। আমার বাবার মুখে কখনও 'বিবেকানন্দ' এই নাম শুনি নাই—তিনি 'নরেন দত্ত' বা 'নরেন' বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিতেন। তাঁহারা নানা গভীর বিষয়ে, মুখ্যতঃ ধর্ম বিষয়ে, এবং খ্রীষ্টান মিশনারিদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির বিষয়ে আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ইংরেজি বাইবেল লইয়া আসিতেন, এবং তাহা হইতে আপত্তিকর এবং যুক্তি-বিরোধী কথা বাহির করিয়া, হেদুয়ার পাশে খ্রীষ্টানদের প্রচার-স্থান একটি ছিল (এখনও আছে), সেইখানে গিয়া উঁহাদের কথা, বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্মের বিরোধী কথার খণ্ডন করিবার প্রয়াস করিতেন।···বাবার সঙ্গে স্বামীজীর এই সংযোগটুকুও ছিল, অথচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার ভাব-শিষ্যা তাপসী ভগিনী নিবেদিতাকে কয়েক বার দেখিয়াছিলাম, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, ভারতের লুপ্ত আত্ম-চেতনার পুনরুদ্ধারে তাঁহার গুরুদেবের অনুপ্রেরণায় নিবেদিতার কৃতিত্বের কথা কিছু কিছু শুনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" ('মনীষী স্মরণে', পৃঃ ১২২)।

ও বিদেশের Classical Music উচ্চকোটির মার্গসংগীতের" প্রতি সুনীতি-কুমারের প্রগাঢ় অনুরাগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল—রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি প্রবল আসক্তির কথা বলাই বাহুল্য। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমারের পুত্রবধূ শ্রীমতী ছায়া চট্টোপাধ্যায়ের উপাদেয় রচনা "সুনীতিকুমার—পুত্রবধূর বন্দনায়" দ্রষ্টব্য

১০। পৃঃ ৬৮॥ ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার শখ ছিল সুনীতিকুমারের, আর ছবি দেখার নেশা ছিল তাঁর দুর্মর—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। পরিচিত অপরিচিত অনেকেই সুনীতিকুমারের অটোগ্রাফ চাইতেন। অনেককেই তিনি অটোগ্রাফের সঙ্গে ব্রাহ্মী বা গ্রীক বা প্রাচীন আরবী লিপিতে কোনো সদুক্তি লিখে কিংবা চটপট কলমের টানে ছোটো একটা স্কেচ এঁকে দিতেন। এরকম বহু স্কেচ নানা জনের কাছে ছড়িয়ে আছে। শিল্পচর্চা অভ্যাস না ক'রলেও, সুনীতিকুমার ছবি আঁকতেন—মনের খুশিতে, একান্তই স্বান্তঃসুখায়। তিনি একবার আমাকে ব'লেছিলেন: 'ছেলেবেলায় মাইয়োপিয়া না হ'লে আমি হয়তো আর্টিস্ট হ'তুম।' তিনি আর্টিস্ট হন নি, কিন্তু তাঁর কলমের টানে আঁকা রেখাচিত্রগুলি দেখে বুঝতে পারা যায়, ছবি আঁকার হাত তাঁর ছিল, যেমন চোখ ছিল তাঁর ছবি দেখার। শিল্পরসিক সুনীতিকুমারকে অনেকেই জানতেন, কিন্তু সুনীতিকুমারের শিল্পি-পরিচয় জানতেন অল্প লোকেই। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম ক'রতে হয় সাহিত্যশিল্পী পরিমল গোস্বামী মশায়ের। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে 'কথাসাহিত্য' পত্রের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংবর্ধনা সংখ্যায় তিনি "শিল্পী ও শিল্পরসিক সুনীতিকুমার"-এর কথা বলেন, বিশেষ ক'রে শিল্পী সুনীতিকুমারের কথা—তাঁর কথার যাথার্থ্য হিসাবে তিনি সুনীতিকুমারের আঁকা তিনখানি ছবিও ছাপিয়ে দেন (এর মধ্যে একখানি ছবি ইতিপূর্বে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, দক্ষিণ ভারত থেকে প্রকাশিত *Tamil Culture* পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় ছাপা হয়)। পরিমলবাবু সুনীতিকুমারকে ঠিকই চিনেছিলেন: "...বিজ্ঞানী হ'লেও অন্তরে অন্তরে তিনি শিল্পী এবং শিল্পলোভী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যত আকর্ষণ থাক, তাতে কৃতিত্বের যত আনন্দ থাক, তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ এবং আসক্তি শিল্পে।" স্বধর্মে সুনীতিকুমার ছিলেন প্রকৃত শিল্পী, শিল্পীর দৃষ্টিতেই তিনি সব কিছু দেখেছেন—জীবন, প্রকৃতি, মায় ভাষা পর্যন্ত। আকাশবাণীর এক বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি ব'লেছিলেন : "ছবির প্রতি আকর্ষণই আমাকে ভাষার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।"